KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : শিশির চট্টরাজ?
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 5, 7, 8, 17	Year of Publication : ?, ?, 1971-72, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮১
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : শিশির চট্টরাজ?	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা ত্রৈমাসিক

অন্যদিন

129

শারদ সংখ্যা ঃ সপ্তম সংকলন

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

মহান ঔপন্যাসিক **তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়** ও কবি **জর্জ সেফেরিস**-এর দেহান্তরে সমগ্র মানব-সংস্কৃতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হল তার জন্যে আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনা জ্ঞাপন করছি

অন্যদিন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্যদিন

[redacted] ১৩৭৮ সপ্তম সংকলন

প্রবন্ধ

শিশির ভট্টাচার্য * ভবানী মুখোপাধ্যায়

কবিতা

অতুলরঞ্জন দেব * অনন্ত দাশ * অনুপম দত্ত * অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় * অমিতাভ চক্রবর্তী * অমিতাভ দাস * আনন্দ বাগচী * উদয়ন ভট্টাচার্য * কমল সাহা * কমল চক্রবর্তী কুমারেশ চক্রবর্তী * গোলাম সাবদার সিদ্দিকি * গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় * গৌরাঙ্গ ভৌমিক * জয়ন্তী সেন * জীবন সরকার * জীবনময় দত্ত * জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায় * তপন বন্দ্যোপাধ্যায় * দিব্যেন্দু পালিত * দীপক দত্ত * দীপঙ্কর দাস * ধূর্জটি চন্দ * নগেন্দ্র দাস * পলাশ মিত্র * পুলক গোস্বামী * প্রণব মাইতি * প্রতিমা সেনগুপ্ত * বিনয় মজুমদার বিমল দেব * বিশ্বনাথ ঘোষ * বীরেন মিত্র * মণীন্দ্র রায় মৃণাল বসুচৌধুরী * মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় * মৃণাল চট্টোপাধ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা * রঞ্জিতকুমার সরকার * রফিক নওশাদ * রুদ্রেন্দু সরকার * শান্তনু দাস * শিপ্রা ঘোষ * শিবশম্ভু পাল শিশির সামন্ত * শিশির ভট্টাচার্য * শ্যামলকান্তি দাশ শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য * শেখ নজরুল ইসলাম * সত্য গুহ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত * সাগর চক্রবর্তী * সাধনা মুখোপাধ্যায় সুচেতা মিত্র * সুদেব সানা * সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় * সুনীল মুখোপাধ্যায় * সুমিতকুমার ঘোষ * সুশীলকুমার গুহ সৈয়দ কওসর জামাল

অন্যদিন প্রধানত তরুণ কবিদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক জীবনধর্মী কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিট পাঠাবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫ ফোন ৪৬-৩৭১৪।

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১নং রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯

দাম ঃ একটাকা। বার্ষিক ঃ চারটাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

বিদেশী ভাষা থেকে

জার্মান

ইনগেওর্গ বাখমান

অনুবাদ : নচিকেতা ভরদ্বাজ

অসমিয়া

নগেন শইকীয়া

অনুবাদ : সুশ্রী সুজাতা প্রিয়ংবদা

ওড়িয়া

ব্রজনাথ রথ

অনুবাদ : সুশ্রী সুজাতা প্রিয়ংবদা

আলোচনা

শিশির ভট্টাচার্য * সন্তোষকুমার অধিকারী * শান্তনু দাস

আধুনিক কবিতা ও পূর্ব ইউরোপের কয়েকজন

শিশির ভট্টাচার্য

ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক কবিতার যুগ শেষ হয়ে কাব্যে আধুনিকতার ঢেউ ফ্রান্সেই লেগেছিল প্রথম। ফরাসী কাউন্টার রোমাণ্টিসিজম এর গুরু ছিলেন শার্ল বোদলেয়র। তারপর তাঁর প্রদর্শিত পথে একে একে এগিয়ে আসেন—আর্থার র‍্যাঁবো, স্টিফেন মালার্মে, পল ভালেরী এবং পরে বর্তমান যুগের আরও অনেকে। এই সময়ের ভেতরে আধুনিক কবিতার ফর্ম ও টেক্সট ফরাসী দেশের ভৌগলিক চৌহদ্দি ডিঙিয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং সেখান থেকে ক্রমে পৃথিবীর আরও অনেক দেশেরই কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে অনুপ্রবেশ করেছে এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বোদলেয়রীয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই আটকে থাকে নি।

কবিতা অনেক ভেঙেছে। রূপও বদলেছে অনেক। এসেছে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ ছাড়াই শুধু ধ্বনিময় শব্দ প্রয়োগের কবিতা ; এসেছে শুধু পদাংশ বা সিলেবল্ আর ছন্দের বিচিত্র কারুকর্ম দিয়ে রচিত তথাকথিত বিশুদ্ধ কবিতা ; এসেছে বাস্তব বর্ণনা, অর্থজ্ঞান, ব্যাকরণজ্ঞান নীতিজ্ঞান বহির্ভূত অর্থাৎ কিনা একেবারেই বক্তব্যশূন্য সিম্বলিক বা প্রতীকবাদী কবিতা। তারপরেও ভেঙেছে এবং ভাঙছে। এসেছে স্যুররেয়ালিস্ট্ কবির দল, ডাডাইস্ট্ কবির দল, স্ট্রাকচুরালিজম্ এর ধুয়া, এসেছে ছন্দের বাঁধন ছাড়া ভ্যার্ লিব্র্ বা ফ্রিভার্স এর ঢেউ এবং তার পরেও একেবারে হাল আমলে এসেছে পোয়েজি আঁগাজে—যা নাকি প্রচলিত পুঁজিবাদী সামাজিক ভাষা ও ব্যাকরণ না মেনে নতুনতর শব্দ সৃষ্টি করে গড়া মার্ক্স্ দর্শনের সবচেয়ে কাছাকাছি জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ (এই কবিদের মতে অবশ্য) কাব্য।

ফ্রান্সের সবচেয়ে কাছাকাছি আরও যে সব দেশে আধুনিক কাব্যের এই ঢেউ গিয়ে পৌঁছুল তারা হচ্ছে যথাক্রমে প্রথমে জার্মানী, তারপর ইতালী ও পরে ইংল্যান্ড এবং স্পেন। বস্তুতঃ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপীয় কবি ও শিল্পীর চেতনায় যে রোমাণ্টিক রিভাইভালের ঢেউ এসে উপস্থিত হয়েছিল, পরবর্তীকালের শিল্পবিপ্লবের যুগে মানুষের অর্থনৈতিক ও সমাজ-

নৈতিক নবমূল্যায়ণের জোয়ারে তা নতুনতর খাতে প্রবাহিত হল। চিন্তা ও দর্শনের নতুন নতুন তত্ত্ব এবং তথ্যে দিকে দিকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হতে লাগল এবং এই সর্বাঙ্গীণ জাগরণ ইউরোপের ; বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতেই তীব্রভাবে অনুভূত হল। এই সব দেশের শিল্প, সাহিত্য ও কাব্যের ধারার সঙ্গে আমরা সকলেই আজ কম বেশী মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের দেশগুলো অর্থাৎ ভূমধ্য সাগরের পূর্বভাগ, আদ্রিয়াতিক সাগরের উত্তর অংশ ও বাল্টিক সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত দেশ ; তারা এই নবজাগরণে সমান অংশ নিতে পারে নি। তার কারণ ছিল এই সমস্ত দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশের অস্থিরতা। এই অস্থিরতা কোন কোন জায়গায় এত ব্যাপক আর উপর্যুপরি ছিল যে অনেক ক্ষেত্রে এদের নিজের নিজের অস্তিত্বটুকু কোনক্রমে টিঁকিয়ে রাখাটাই দীর্ঘদিন ধরে একটা জীবন মরণের সমস্যা বিশেষ ছিল। এবং এই সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তেই জাতির ধমনী স্পন্দনের সঙ্গে নিজেদের নাড়ির স্পন্দন মিশিয়ে দিয়ে যাঁরা বারবার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ হলেন এই সব দেশের কবি শিল্পী ও সাহিত্যিকের দল।

পশ্চিম ইউরোপের শিল্প ও সাহিত্যের নতুন নতুন ধারা, পরীক্ষা নিরীক্ষার নতুন নতুন পথ এঁরাও অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন, তবে হয় তো একটু দেরীতে। আমরা আধুনিক কবিতার এই আলোচনায়, এখানে পূর্ব ইউরোপের এই সমস্ত দেশের কয়েকটি থেকে আপাততঃ সাতজন কবিকে বেছে নিচ্ছি। এঁরা সাতটি বিভিন্ন মৌলিক ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজেদের কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে মোটামুটি খ্যাত ও আদর্শস্থানীয় কবি। এঁদের মধ্যে জীবিত কবিদের সকলেই এখনও সক্রিয়-ভাবে কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কবিতার অনুবাদগুলি সবই মূলভাষার ইংরেজী অথবা ফরাসী ভাষান্তরের থেকে গদ্যে করা হল। মূল ভাব ও ভাষা যথাসম্ভব অবিকল রাখবার চেষ্টা করা হল।

১ বুলগার কবি লিউবোমির লেওচেভ্ (Lyubomir Levchev)

তরুণ কবি লিউবোমির লেওচেভ্-এর জন্ম ১৯৩৫ খৃঃ। কবিতা লিখছেন গত বছর দশেক হল। আর এই অল্প সময়ের মধ্যেই লেওচেভ্ আজ

বুলগেরিয়ার সর্বাধিক পঠিত জনপ্রিয় কবি। আজ পর্যন্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ছ'খানা। 'তারাগুলি আমার' (১৯৫৭), 'চিরদিনের জন্যে' (১৯৬০), 'অবস্থানগুলি' (১৯৬২), 'কিন্তু আমি বুড়ো হয়ে যাবার আগেই' (১৯৬৪), 'প্রবণতা' (১৯৬৬), এবং 'অবজারভেটরী' (১৯৬৭)। 'আবৃত্তি' নামে আরও একখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার মুখে। আধুনিক রুশ কাব্য সাহিত্যে ইয়েভ্তুশেংকো ও ভোজ্নেসেন্স্কির যে অবদান বুলগার কাব্য সাহিত্যে লেওচেভ্-এর দান তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। জীবনদর্শনে লেওচেভ্ আশাবাদে বিশ্বাসী। লেওচেভের নিজের মতে তাঁর ওপর মায়াকোভ্স্কি এবং টি এস এলিয়টের প্রভাব কিছুটা আছে।

দিনের আকাশে চাঁদ

মাটি, আকাশ আর 'জিজ্ঞাসা' দিয়ে
তৈরী এই পৃথিবীটা।
আমিও,
আর সবার মত,
চেষ্টা করছি এইটেই বুঝতে,
ফর্মুকে ফর্মুলায় পরিণত করতে
জ্ঞানকে প্রয়োজনীয়তায় পরিণত করতে···
কিন্তু কেন,
ট্রামে বসে হালফিল খবর পড়তে পড়তে,
কিম্বা পরে,
মনিবের রাশভারী গলার আওয়াজ শুনতে শুনতে,
কেন আমি
আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাই ?
দিনের বেলার চাঁদ,
কেন আমি টিকে ওঠার দাগের মতই ক্ষীণপ্রায়
তোমার উপস্থিতির কথাই ভাবি ?—
কেন ?
···ক্যানটিনে,
অথবা প্রয়োজনীয় কোন প্রবন্ধ শেষ করতে করতেও,

তোমার কথা ভাবা আমি বন্ধ করতে পারিনে কেন ?
দিনের চাঁদ—
স্বচ্ছ শুভ্র এক প্রেত তুমি—
গোপনতা বিশেষ একটি…
আনমনা করে দাও তুমি আমাকে।

রোদ ঝলমলে এই বিকেল বেলায় তুমি কেন ?
তুমি কি গতকাল থেকেই রয়ে গেছ ?
অথবা আগেই উঠেছ আজ ?
এই দুইয়েরই অর্থ তোমার কাছে হয়তো এক,
কিন্তু আমার কাছে নয় !
আমি ক্ষণস্থায়ী,
আমার কবিতার মতই স্বল্পায়ু,
আমি সবকিছু পরিস্কার করে বুঝে নিতে চেষ্টা করি।

নীলকাশে ছুঁড়ে ফেলা,
হে নববধূর উত্তরীয় !
তুমি কি বিগত রাত্রির স্মৃতিমাত্র
অথবা ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে নিহিত
বস্তুর কোন চেতনা বিশেষ ?…

২ পোল কবি জেস্‌লে মিলোজ্‌ (Czeslaw Milosz)

বর্ষীয়ান পোলিশ কবি জেস্‌লে মিলোজ এর জন্ম প্রথম মহাযুদ্ধের সম সাময়িককালে। কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে—রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পোল্যাণ্ডে হলেও ভৌগলিক দিক থেকে লিথুয়ানিয়ায় অবস্থিত হ্বিল্‌নো সহরে। মিলোজ এর শিক্ষা দীক্ষাও ঐ সহরেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিলোজ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ। সুতরাং সেই সময়কার পুরো রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ঘটনার ঝড়-ঝাপটা, ঘাত প্রতিঘাত তাঁর চোখের সামনেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আর তাই তার উত্তাপও তাঁর নিজের জীবনে কম পড়েনি। তাঁর জীবন ও তাঁর কবিতা তাঁর অভিজ্ঞতার আলোয় অঙ্গাঙ্গী

এক। যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সে নির্বাসনের দিনগুলোতে কি যুদ্ধোত্তরকালে পোলিশ দূতাবাসের কর্মচারীরূপে আমেরিকায় থাকাকালীন অথবা তারও পরবর্তীকালে পোল্যাণ্ডে ফিরে আসার পর কবিতাই মিলোজের কাছে প্রাত্যহিক জীবনের স্পন্দন। তাঁর কবিতা তাঁকে যেমন এনে দিয়েছে রাজরোষ তেমনি এনে দিয়েছে সম্মান প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা। তিরিশ দশকের পোলিশ কাব্যসাহিত্যে রোমান্টিসিজম্‌, সিম্‌বলিজম্‌ এরই জয় জয়কার ছিল। পরবর্তী যুগে তথাকথিত 'প্রলিতারিয়ান' কবিতার একটা ঢেউ আসে। কিন্তু কবিতায় সত্যিকারের নতুনতা যাঁরা নিয়ে আসেন তাঁরা তরুণতর কবিগোষ্ঠি। এই আভাঁ গার্দ (avant-garde) কবি গোষ্ঠির সবচেয়ে তরুণতম অথচ সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত কণ্ঠ যাঁর ছিল তিনি জেস্‌লে মিলোজ। সেই যুগেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জমাট বাঁধা সময়ের কবিতা' (Poemat o czasie zastyglm-1933) পাঠক সমাজে আলোড়ন আনে। পোল্যাণ্ডের প্রথম সারির একজন কবি হিসেবে সেদিনই তাঁর আসন চিহ্নিত হয়ে যায়। যুদ্ধোত্তর যুগে মিলোজের কবিতার ফর্ম অত্যন্ত সহজ সংযত এবং আড়ম্বর শূন্য। জেস্‌লে মিলোজ আজ পোল সাহিত্যের একজন অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ কবি সন্দেহ নেই।

আমার জন্মভূমিতে

আমার জন্মভূমিতে, আমি আর ফিরে যাবো না,
বনের ভেতর সেই হ্রদ—
আমি এখনও দেখতে পাই সেই দিগন্ত বিস্তৃত
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের স্তূপ—
যখনই আমি পেছন ফিরে তাকাই।

আর সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে অগভীর স্রোতস্বতী জলের
সেই নিঃস্বন,
এবং নিচে ধারালো ঘাসের ফলাগুলি,
শংখ চিলের তীক্ষ্ম ডাক, শীতল ও সিক্ত সূর্যাস্তগুলি
অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া বুনো হাঁসেদের ডাক।

ছায়াময় এই হ্রদ এখনও আমার স্বপ্নের জগতে ঘুমিয়ে আছে
আমি ওর জলে ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে দেখি নিচে
আমার জীবনের দীপ্তি। এবং মৃত্যু আমার চূড়ান্ত ভাগ্য
নির্ধারিত করে ফেলার আগে
আমার ভীতি উৎপাদনকারী যাবতীয় কিছুর ছবিই আমি
দেখতে পাই সেখানে।

৩ য়ুগোশ্লাভ কবি ভাস্‌কো পোপা (Vasko Popa)

১৯৫৩ খৃঃ যখন ভাস্‌কো পোপার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আবরণ' (kora) প্রকাশিত হল তখন অধিকাংশ য়ুগোশ্লাভ পাঠক এবং সমালোচক যাঁরা তদানীন্তন য়ুগোশ্লাভ কবিতার কোন আধুনিকীকরণের প্রয়োজন স্বীকার করতেন না তাঁরা পোপার এই গ্রন্থ দেখে নাক সিঁটকেছিলেন। চিরাচরিত ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক কবিতার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে আরেক কবি মিওদ্রাগ পাভ্‌লোভিচ্‌ এর মতো ভাস্‌কো পোপার ভাগ্যেও একই অভ্যর্থনা জুটেছিল। তার পর অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে পোপাকে, অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। আজ য়ুগোশ্লাভ সাহিত্যে আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে ভাসকো পোপার নামই সবার প্রথমে উচ্চারিত হয়। এঁর জন্ম বিশের দশকে (১৯২৩)। লিখেছেন খুব কম। গত পনের বছরে লেখা মোট কবিতার সংখ্যা একশ' সত্তরটির বেশী নয়। সর্বসমেত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে আজ পর্যন্ত। শেষ কাব্য 'দ্বিতীয় আকাশ' (sporedno nebo) প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৯ সালে। প্রথম বয়সে পোপা সুররেয়ালিস্ট্‌ কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তারপর অল্প কিছু পরেই তিনি কবিতায় নিজস্ব একটা ঢং খুঁজে নেন। জার্মান কবি রিল্‌কে হয়তো তাঁর ওপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন একদা। পোপার কবিতাগুলো আকারে ছোট ছোট। সরল সহজ প্রকাশ ভঙ্গী। প্রায়শঃ অতি সামান্য জড় বস্তুই তাঁর বিষয়। কিন্তু বর্ণনার গুণে অসামান্য হয়ে ওঠে।

আমাদের গভীরতম ভেতরে

অনন্তকালের বিষাক্ত বৃষ্টিধারা
লোভীর মতই আমাদের দংশন করে চলেছে…

আমাদের মাথার চারদিকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণরত
বুলেটের আওয়াজ তোমার কানে পৌঁছেছে কি ?
আমাদের চুম্বনের প্রতীক্ষাতেই আছে ওটা…
তোমার ওষ্ঠের সামনে
কোন এক অদৃশ্য গরাদের অন্তরালে
আমার নিরাবরণ কথাগুলো তুষারীভূত হয়ে যায়।
নির্মম করাতগুলোর দাঁত থেকে মুহূর্তগুলিকে
হিঁচড়ে টেনে বার করে নিয়ে আসছি আমরা।

৪ চেক কবি ফ্রানতিসেক হালাস (Frantisek Halas)

ফ্রানতিসেক হালাস (১৯০১—১৯৪৯) আধুনিক চেকোশ্লাভ কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি। রাজনৈতিক চেতনায় কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ইনি। পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে স্ট্যালিনপন্থী রুশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের কাছে হালাস ও তাঁর কবিতা মুক্তির দ্যোতকরূপে চিহ্নিত হন। জীবিতাবস্থায় হালাস, চেক মিনিষ্ট্রী অব ইনফরমেশনের পাব্লিকেশন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। হালাসের সমস্ত জীবন ও কবি-চেতনা তাঁর মুক্তিকামী বিদ্রোহী রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে অভিন্ন ও একাত্ম ছিল। কিন্তু হালাস বড় বেশী বুদ্ধিদীপ্তির কবি। জীবনের অর্থ তাঁর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর লেখা অসাধারণ শক্তিশালী সন্দেহ নেই কিন্তু জটিলও বটে। জগৎ ও জীবনের প্রতি হালাস-এর দৃষ্টিভঙ্গী কতকটা নিরাশাবাদী, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় এবং দার্শনিকসুলভ।

নিচের উদ্ধৃত হালাসের কবিতাটি তাঁরই একটি কবিতা প্রতিকৃতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। পৃথিবীর মাটির গভীরে যেন শিকড় চারিয়ে দিয়ে তাঁরই নিজস্ব দাঁড়াবার ভঙ্গীতে, তাঁর অনমনীয়, স্পর্ধিত গর্বোন্নত শিরের উচ্চতায়, ঠিক তাঁরই সতেজ সরল ও বলিষ্ঠ গতিশীলতায় কবিতাটি অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

বনস্পতি

বনস্পতি মিনারের মতই উর্ধে উঠে যায় ঝড়কে একপাশে ঠেলে ফেলে
নিজের আকার তার প্রতিনিয়তই লড়াই করে চলে স্থান সংকুলানের জন্যে
উত্তরের হাওয়াই বয়ে যাক, অথবা বৃষ্টিই ঝেঁপে আসুক

এটাই ওর বিশেষ অধিকার, অহংকার ওর—
সমস্ত রস তার অন্তরতম প্রদেশে নেমে আশ্রয় নেয়
যেখানে বাহিরের কেউ ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে না
সেখানেই প্রবাহিত হয় ধারা, সমস্ত ঐকান্তিকতা আর ফেনায়িত উচ্ছ্বাস নিয়ে
পরিচিত সঙ্গীতটিই গাইবার জন্যে

বনস্পতি তার গোপনতা সৃষ্টি করে, রক্ষা করে এবং
চারদিকে বাধাও তৈরী করে তার
প্রবঞ্চনাময় মর্মরধ্বনির উচ্চারণে গান গায়
যখন নীরবতার গভীরে জাফরির বাধার পশ্চাতে
অত্যাচারিত মুমূর্ষদের কন্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে
সমস্ত প্রাণময় নির্ঝরের গর্জন
যার আড়ালে ঘৃণার ধিক্কারে সংঘাত পরিহার করে
শান্তির কামনা করে যারা তাদের সব কন্ঠই মিশে এক হয়ে যায়
আর তখন
পৃথিবীর অভ্যন্তরের শক্তিগুলি
মৃত্যু এবং জীবন এই দুটো শব্দকেই জোর করে মিশিয়ে একাকার করে দেয়।

৫ রোমানিয়ার কবি টিউডর আরগেজি (Tudor Arghezi)

রোমানিয়ান কাব্য সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে প্রিয় কবি টিউডর আরগেজি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের শেষ পাদে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। আর তাঁর মৃত্যু হয় এই সেদিন ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে। বিগত সাতটি দশক জুড়ে আরগেজি সমস্ত রোমানিয়ার সাহিত্য আকাশে এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের দ্যুতি নিয়ে ভাস্বর ছিলেন। তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা, কাব্যকৃতি এবং দর্শন ছিল ওতঃপ্রোতভাবে একই। রোমানিয়ান কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত তিনিই করেন কিন্তু সুররেয়ালিস্ট কি সিম্বলিস্ট কারো এক বগ্‌গা নীতিতেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কবিতাকে তিনি ভেঙেছেন, ছন্দের বাঁধাধরা সীমা থেকে মুক্তি দিয়েছেন ; সহজ অর্থের সাবলীলতা থেকে জটিলতর করেও তুলেছেন কিন্তু সমস্তই কবিতারই প্রয়োজনে। কবিতায় চিত্রধর্মিতাকে তিনি অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতেন।

আমি তুষারে অবগাহন করি, প্রস্তর শয্যায় ঘুমোই,
যেখানে ছায়ারা ভেদ করে যায় স্ফুলিঙ্গগুলিকে উড়িয়ে দিই আমি।
শান্তির রাজত্ব যেখানে, আমি শিকলে নাড়া দিই,
এবং আমার শংখল দিয়ে ভেঙে ফেলি দরজাটা।
আমি যখন চূড়োয় গিয়ে পৌঁছই,
বিপদকে খুঁজে বার করে নিই এবং উত্তেজিত করে তুলি তাকে,
সমস্ত পাহাড়টাকে কাঁধে তুলে নিয়ে
সংকীর্ণ পথটা লাফ দিয়ে ডিঙোতেই ইচ্ছা করে আমার।

* * * * * * *

দীর্ঘ ইতিহাসের ধারায়, এখন একাই
আমাদের প্রত্যেকের একে অন্যকে পরিমাপ করা উচিত,
আমি বিজয়ী হব এ রকম ইচ্ছে না করেই—
আমার ইচ্ছে হয়
তোমাকে ছুঁয়ে চিৎকার করে বলে উঠি ঃ 'বেঁচে আছে ও !'

৬ হাঙ্গারীর কবি সান্দর ভোরোয়েশ (Sandor weores)

যদি নরকে যাও, একেবারে গভীরতম নিচে নেমো।
সেখানেই স্বর্গের দেখা পাবে। কারণ সমস্ত জিনিষ
একই বৃত্তে এসে মিলিত হয়।

অথবা

তুমি অনন্তকাল থেকেই ঈশ্বরের চিন্তা হয়ে আছো,
তোমার অস্তিত্ব তাঁর মনে অটল পাহাড়ের মতো।
এর তুলনায় তোমার শুককীটের মতো জীবনটা এমন কি আর ?
মৃত্যু আর তোমাকে কেমন করে বদলে দেবে ?

না, এগুলো বেদান্ত থেকে নেওয়া কোন উদ্ধৃতি নয়। দুটো কবিতার অংশমাত্র। লেখক ঃ আধুনিক হাঙ্গারীয়ান কাব্য সাহিত্যের সবচেয়ে বিতর্কিত

* Psalmi

এক ব্যক্তিত্ব, কবি সান্দর ভোরোয়েশ। সত্যি ভোরোয়েশ বিংশশতাব্দীর এক দুর্লভ বিশ্বপ্রেমিক কবিসত্তা। যুগপৎ বিপ্রতীপ চিন্তা, মনশীলতা ও প্রকাশ ভঙ্গীতে হাঙ্গারীর এই মহাবিতর্কিত প্রাচ্যদর্শন ঘেঁষা বিদগ্ধ কবি অজস্রবার তাঁর সমালোচক বৃন্দ এবং পাঠকদের কাছে সমান ভাবে হতবুদ্ধির কারণ হয়েছেন। কবিতার আঙ্গিকে, অর্থে, ছন্দে, রূপকে, চিত্রকল্পে কোথাও ইনি কোন বিশেষ স্টাইলের ধার ধারেন না। একই সময়ে লেখা তাঁর কোন কবিতা নিতান্ত বিদগ্ধজনের কাছেও হয়তো অত্যন্ত দুরূহ ও দুর্বোধ্য মনে হয়েছে আবার কোন কবিতা হয়তো একেবারে ছেলে ভুলানো ছড়ার মত সহজ ও শিশুসুলভ মনে হয়েছে। ভোরোয়েশের এমন অনেক কবিতা আছে যা একেবারেই অর্থশূন্য। কিন্তু সুরে বাঁধা বলে পাঠকের ওপর তার এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কবির নিজের কথাতেই বলতে গেলে—'আদিম মানব সমাজে সুরের সৃষ্টিই তো প্রথমে হয়েছে। অর্থের সন্ধান পরে করেছে মানুষ।' অর্থশূন্য আবোল তাবোল এই রকম একটা সুরের কবিতার উদাহরণ দেওয়া যায় এখানে,—

Fa toven	গাছটার নিচে
tekereg a	একটা ছোট্ট সাপ
kicsi kigyo	গা মোচড়াচ্ছে।
Tarajos	ঝুঁটিওয়ালা
lila-feju	বেগনী লাল মাথা
kiesi kigyo	ছোট্ট সাপ
Szivemet gyujtsad	আমার হৃদপিণ্ডে আগুন জ্বালায়
derekamat oltsad !	আমার কটিদেশ নিভিয়ে দেয় !
Fa toven	গাছটার নিচে
tekereg a	একটা ছোট্ট সাপ
kicsi kigyo.	গা মোচড়াচ্ছে।

ষাটদশকের গোড়ার দিকে এই রকম কেবল ধ্বনি বহুল শব্দে সুর যোগ করে ভোরোয়েশ অনেক কবিতা লিখেছিলেন। এদিক দিয়ে তাঁকে হাঙ্গারিয়ান কাব্য সাহিত্যে একজন আভাঁগার্দ (avant-garde) বলা চলে। আবার সুর ছাড়া অনেকটা এই রকম ধরণের কিছু কবিতাও লিখেছেন তিনি পরে, যেখানে বিভিন্ন পাশাপাশি বাক্য এবং কবিতার চরণের মধ্যে কোন যুক্তিগ্রাহ্য

সম্পর্কই হয়তো নেই। তবু কবির মতে এই ধরণের উল্টোপাল্টা কিছু শব্দ বা বাক্য পাঠকের মনে নাকি এক একটা ভাবের অনুসঙ্গ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। আর সেখানেই হল এর সার্থকতা। যেমন—

চন্দ্র সূর্যের পেছনে
রশ্মি বৃত্ত
গভীর গুড় গুড় আওয়াজ
তুলে ধরে

খাড়া উঁচু পাহাড় ঝোলে
সূর্য চন্দ্রের পেছনে
তারাগুলি
শীতল শূন্যতা।

হাঙ্গারীয়ান আধুনিক কবিতার এই এক নমুনা। এর সার্থকতা হয়তো আগামী দিনের পাঠকেরা বিচার করবে। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'ডুবন্ত শনি' (Merulo saturnus)-তে রাজনীতিতে অবিশ্বাসী ভোরোয়েশ লিখছেন,

রাজনীতি

মরিচীকাটাকেই এত সম্ভাব্য বলে মনে হয়
আর বাস্তবতাকে এত অসম্ভব···

একজন যথার্থ কবির উক্তিই সন্দেহ নেই। সান্দর ভোরোয়েশ এর জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেই। ১৯১৩ সালে। অথচ মননশীলতার দিক থেকে তিনি একেবারে তরুণতম সন্দেহ নেই।

আলোর ফুল

আলোর ফুল
মাথার কাছটায়
কেঁপে কেঁপে
নিভে গেল

কাঁধের ওপর দিকটায়
থুতনির নিচে

একটি নিঃসঙ্গ রাতের আলো
জ্বলে উঠলো

বুকের সামনে
ফিতের মত ফেনা উড়ছে
সেখানে আগুন ইতিমধ্যেই
স্তিমিত হয়ে হয়ে নিবে যাচ্ছে

পেটের উঁচু দিকটায়
বিরাট ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে
একটা ছায়া

অন্ধকার সমুদ্রে
কোন পদক্ষেপই টেঁকে না
ছেড়ে যাওয়ার আশংকায়
শয়তান ঘোঁট পাকায় শুধু

৭ এস্তোনিয়ার মহিলা কবি বেত্তি আলভের (Betti Alver)

কবি আলভের জন্ম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। ইনি প্রথম জীবনে ঔপন্যাসিক হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ধুলো আর আগুন' (Tolm ja Tuli) প্রকাশিত হয়ে পাঠক ও সমালোচকদের রীতিমতো বিস্মিত করেছিল। প্রথম কাব্যগ্রন্থেই এতটা পরিণত কবিকৃতি ও উৎকর্ষতা কেউ আশা করেন নি!

এর পরই ইউরোপে যুদ্ধের আগুন লাগলো আর সেই আগুনের আঁচে এস্তোনিয়ার ভাগ্য অনেক দুঃখ দুর্দশা ও লাঞ্ছনার অন্ধকার রাত্রি পার হয়ে এলো। সমস্ত দেশটা রাশিয়া ও জার্মানীর যুদ্ধের পাঁয়তাড়ায় কুরুক্ষেত্রের আকার ধারণ করল। ১৯৩৯ সালে এস্তোনিয়া রুশ কুক্ষিগত হল। ১৯৪০ সালে সে সোভিয়েট ইউনিয়নের একটা অংগরাজ্যে পরিণত হল। '৪১ সালে জার্মানী দখল করে নিল। '৪৪ সালে রাশিয়া আবার পুনর্দখল করল তাকে। সমস্ত দেশটা জুড়ে একটা বিভীষিকার রাজত্ব বিরাজ করল দীর্ঘ কয়েক

বছর ধরে। এই পরিবেশে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না কোথাও। বেত্তি আলভেরও দীর্ঘ দিন নীরব হয়ে গেলেন। প্রায় কুড়ি বছর পর ১৯৬৪ খৃঃ তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করলেন পুশকিনের কিছু লেখার এক অপূর্ব অনুবাদ কাব্যের ভেতর দিয়ে। এর বছর দুয়েক পর তাঁর সংকলন গ্রন্থ 'নক্ষত্র মুহূর্ত' (Tahet und) প্রকাশিত হল। এর মধ্যেই সুইডেনের এক প্রকাশক আলভেরের পূর্ব প্রকাশিত কিছু কবিতা নিয়ে আর একটি সংকলন বার করেছিলেন। কবি বেত্তি আলভেরের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছিল। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক আলভেরের কাব্যপ্রতিভার ওপর এক মূল্যবান প্রবন্দে তাঁকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেবার গোড়াপত্তন করলেন। মন ও আত্মা, বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ আলভেরের কবিতার একটা প্রধান সুর। এঁর অনেক লেখায় বোদলেয়রের কিছু প্রভাবও বেশ স্পষ্ট।

নিয়তির মুহূর্ত

জীবনের চৌমাথায় এসে অস্থির ঝড়
কিছুই শুধোবে না
নিজের গরজে সাড়া দেওয়া তোমারই প্রয়োজন।

রাত্রি যতই গভীর আর আঁধার হোক
কপাল থেকে নাম মুছে ফেলতে পারবে না তুমি

গাছের পাতাটাও আলোর অনুসরণ করে
আর তারপর আর সবার সঙ্গে ঝরে পড়ে।
কিন্তু একাই—

একটা উজ্জ্বল লক্ষ্যেরই কি অভাব শুধু? তবে যাও
কার্যকারিতা শেখো গে।

ধীরে ধীরে মানুষকে মৃদু করে দেয় কিসে জাননা কি?
নিষ্ঠুরতা কেন হঠাৎ আসে না কখনো?
কেন জীবনে নিয়তির মুহূর্ত একবারই আসে?

ঝড়ের রাতেও মানুষের প্রতীক্ষায় কম্পমান বাতির শিখাটি
কেমন করে টিঁকে থাকে ?

তোমার চেয়ে উৎকৃষ্টতরদের জিগ্যেস কর
জিগ্যেস কর জীবিতদের। মৃতদেরও শুধোও।

কিন্তু চলমান সময়কে কখনো শুধিও না তাদের কথা
'লেথ' প্রান্তর পেরিয়ে অন্ধকারের গভীরে হঠাৎ চলে গেছে যারা।

বিশ্বাস কর, মাঝি দৈবাৎ তাদেরকে বিস্মরণের দুয়োরে
পৌঁছে দিল কিনা, গ্রাহ্যও করে না ওরা।

গ্রন্থ পরিচয়

১। মুরাল্ অব্ টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি—ত্রৈমাসিক, নবম সংখ্যা ১৯৬৭
২। ন্যুভেল্ রাভু ফ্রাঁসেজ্—আগষ্ট ১৯৬৯
৩। বুক্স্ অ্যাব্রড—ভলিউম ৪৩ সংখ্যা ১, ১৯৬৯
৪। এ পোয়েট্স্ রোড টু ইঠাকা বিটুইন ওয়ার্ডস্, ওয়ারস্ অ্যাণ্ড্ পোয়েটিক্স্—ৎস্বিগনিউ ফোলেজেভ্কি লিখিত
৫। দি রক অ্যাণ্ড দি রুটস্—ভেরা ব্লাকওয়েল লিখিত
৬। পোয়েট্রি অব থিংগ্স্ ইন এ ভয়েড্—ভাসা মিথাইলোভিচ্ লিখিত
৭। লিউ বোমির লেওচেভ্: অ্যাণ্ড মডার্ণ বুলগেরিয়ান পোয়েট্রি—ৎস্ভেতান স্তোইয়ানভ লিখিত
৮। পোয়েট ফর কনটেম্পোরারি ম্যান—জর্জ ইভাসকিউ লিখিত
৯। সানদর ভোরোয়েশ—জর্জ গোমেরি লিখিত

এলিয়টের ভাবনায় সেক্সপীয়র

ভবানী মুখোপাধ্যায়

টি, এস, এলিয়টের Collected poems (1909—1935) নামক কাব্য সংকলনের প্রথম কবিতাটির নাম The Love Song of J Alfred prufrock—এই কবিতাটিতে সেকস্পীয়রের হ্যামলেটের অনেক প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এই সব উল্লেখ থেকে কবিতাটি বিশ্লেষণ করা যায়, এবং কবির মনোবিকলনে সুবিধা হয়। এলিয়ট তাঁর কাব্যে সাহিত্যিক উক্তির প্রতিধ্বনি একরকম ইচ্ছা করেই আমদানী করেছেন এবং এই জাতীয় বিশ্লেষণকে পরোক্ষে উৎসাহিত করেছেন। এই জাতীয় প্রতিধ্বনি, অবচেতন মন থেকেই হোক কি অজ্ঞাতসারেই হোক, সমালোচক অন্য উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ রহস্য উপন্যাসের সন্ধান সূত্রের মত এই সব সূত্র সন্ধান করে সমালোচক আরো গভীরে প্রবেশ করতে পারেন, সূত্রকে উপেক্ষা করে নয়।

এলিয়ট হ্যামলেট বিষয়ে একটি প্রবন্ধও লিখেছেন, এই প্রবন্ধের নাম 'Hamlet and his problems' এই বিষয়ে এলিয়টের মতামত একটি মাত্র উক্তির দ্বারাই প্রকাশিত, সেই উক্তি হোল 'Hamlet is the Monalisa of literature' অর্থাৎ শিল্পজগতের মোনালিসার দুর্জ্ঞেয় হাসিটির মত, হ্যামলেটও দুর্জ্ঞের, অথচ তার মাধুর্য অপরূপ। এই উক্তিটির সমর্থনেই প্রবন্ধটি রচিত, এক কথায় প্রবন্ধটির সার কথা এই। মোনালিসা হোল একটি উত্তরহীন প্রশ্নের মত জিজ্ঞাসাচিহ্ন। কি যে সেই প্রশ্ন আমাদের কারো জানা নেই। প্রশ্ন যদি না আদৌ করা হয় তাহলে কি ভাবে জানা যাবে, কি সেই প্রশ্ন। মোনালিসায় তাহলে প্রশ্নটা কি ? হ্যামলেটেই বা প্রশ্ন কি ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই Love song কবিতাটির প্রথম প্যারাগ্রাফেই উপস্থিত হয়েছে।

Streets that follow like a tedius argument
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming question···
Oh do not ask, "what it is ?"

এই প্রশ্ন গঠন করা সম্ভব, উত্তর দেওয়াও হয়ত সম্ভব, কিন্তু কবির সাহস নেই—

There w ll be time, there will be time
To prepare a face to meet the faces that you meet ;
There will be time to murder and create,
And time for all the works and days of hands
That lift and drop a question on your plate ;
Time for you and time for me,
Bnd time yet for hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions.

প্রুফ্রককে সমাজে দাঁড়াবার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। এই সমাজকে সে ভয় করে, যে প্রশ্ন করার তার সাহস নেই, সেই প্রশ্নটা সামাজিক। যে সব মুখ চোখে পড়ে তারা অনুমোদন করে না, সুতরাং সে প্রশ্ন উত্থাপন করে না। বিবাহ প্রস্তাবের চাইতেও এই প্রস্তাব গুরুতরপূর্ণ। কবিতার যে শিরোনামা তার মধ্যে এই ইঙ্গিত আছে, তাছাড়া উপরি উদ্ধৃত কাব্যাংশের ভাষা থেকেও সেই পরিচয় পাওয়া যাবে। হ্যামলেটেও তেমনি আছে খুন, স্বপ্ন এবং পরিবর্তন!

Do I dare
Disturb the universe ?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.

মানবিক ঘটনা ও দুর্ঘটনায় গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব ও মর্জির দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হয়, এই রীতি শেক্সপীয়রের বৈশিষ্ট্য "Troilus and Cressida" যাঁরা পড়েছেন তাঁরা ইউলিসিসের উক্তিটি লক্ষ্য করুন ঃ

The heavens themselves the planets and this centre
O serve degree, priority and place,
Insisture, course, proportion, season form,
Office and custom, in all line of order ;
And therefore the glorious planet Sol.
In noble eminence enthroned and sphered
Amidst the other, whose medicinable eye
Corrects the ill aspects of planets evil,—ইত্যাদি

হ্যামলেটেও কি সেই প্রশ্ন উপস্থিত নয়? "What plagues and what portents ! What mu'iny !"

এই মিউটিনি বর্তমান বিপ্লবের কালে একটা পরিচিত দুর্বিপাক বা বিপর্যয় বলা চলে। বার্কের উক্তি The people have no interest in disorder কথাটি যখন স্মরণে আসে না তখন আমরা মিউটিনি কিংবা বিপ্লবকে আর বুঝতে পারি না। আমরা হ্যামলেটের প্রতি অতিমাত্রায় সহানুভূতিপরায়ণ, ক্লডিয়াস তার পিতাকে হত্যা করেছে, আর এই সহানুভূতির বশে আমরা এই সমস্যার সামাজিক দিকটার প্রতি চোখ ফিরিয়ে থাকি, ভুলে যাই যে হ্যামলেটও একজন সম্ভাব্য বিদ্রোহী, সে মিউটিনিতে মাততে পারে। ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে, আমরা একটা পক্ষ সমর্থন করেও অপরপক্ষের দিকে থাকতে পারি যতক্ষণ সমস্যাটি একটা সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচনা করি। অনেক স্কচ এবং ইংরাজের মধ্যে কেউ কেউ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহটা দ্বিতীয় জর্জ এবং 'বনি প্রিন্স চার্লস'র মুখ চেয়ে বিবেচনা করেন। আমাদের সহানুভূতি কিন্তু তরুণ সিংহাসনকামীর দিকে। এইভাবেই আমরা যেমন সহানুভূতিশীল তার ওপর তেমনি সহানুভূতি আমাদের প্রিন্স হ্যামলেট সম্পর্কেও। সেক্স-পীয়রের এ এক আশ্চর্য সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টে বিশিষ্ট চরিত্রাবলীর অন্যতম। আমরা তার প্রতি তাই স্নেহান্ধ। সামাজিক দিক থেকে আবার আমাদের সহানুভূতি রয়েছে দ্বিতীয় জর্জ, সম্রাট ক্লডিয়াস প্রভৃতির প্রতি অর্থাৎ নিয়ম এবং শৃঙ্খলার প্রতি ভক্তিভাব।

এলিয়ট সমস্যাটিকে পরিপূর্ণভাবে অবচেতন থেকে চেতন মার্গে টেনে আনেন না,—

I should have been a pair of ragged claws
Scuttling accross the floors of silent seas,

এই উক্তি করেছে প্রুফ্রক হ্যামলেটের চিন্তার প্রতিধ্বনি করে,

"all which, Sir, though I most powerfully and potently believe, yet I hold it not honestly to have it thus set down ; for yourself, Sir, shall grow old as I am, if like a crab you could go backward—"

তাহলে, অন্ততঃ এই দিক থেকে প্রুফ্রক আপনাকে পলোনিয়সের মত মনে করে, পলোনিয়স এবং প্রুফ্রক দুজনেই কর্কট, কিংবা সেই একই কর্কট। এই কর্কট আবার কয়েকটি কবিতার পর আবির্ভূত হয়, Rhapsody on a Windy Night, বিড়ালের পর মানবিক সমাজের বিপক্ষে যে প্রাণী আপনাকে অস্ত্র সজ্জিত করে রেখেছে সে অনেকটা কর্কটের মত। বিড়াল

শিশু হয়ে যায়, তার চোখের গভীরে কবি ডুব দিতে পারেন না, তারপর এই বাধা আলোকিত বাতায়ন হয়ে ওঠে, তার ভিতর দিয়ে পথের ওপর থেকে চোখ নজর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে।

And a crab one afternoon in a pool
An old crab with barnacles on his back
Gripped the end of the stick which I held at him.

এইখানেও কর্কটকে প্রক্ষেপ করা হয়েছে, এবং লেখকসত্তার বাহির সীমানায় সে আছে। এ হল সেই শিশু যার প্রকৃতি কবি ভেদ করতে পারেন না। আবার স্বয়ং কবিও বটে, বহির্জগত থেকে আত্মরক্ষার বর্ম তাঁর আছে। "Of lonely men in short sleeves, leaning out of windows এবং The damp souls of housemaids sprouting despondently at area gates."

নিজস্ব ব্যক্তিগত জগতের বাইরে প্রুফ্রক স্বীকারোক্তি জানায়—

"I have measured out my life with cofee spoons"

এই Love Songএ আরেক উল্লেখ আছে—

"Lazarus, come from the dead,
Comeback to tell you all, I shall tell you all."

আমরা যদি বাইবেলীয় উপাখ্যানের মধ্যে আমাদের সীমিত রাখি তাহলে এর অর্থ উপলব্ধি করতে পারব না, এর মধ্যে হ্যামলেটের সেই অন্তিম উক্তির প্রতিধ্বনি মিলবে—

Had I but time (as the fell Sergent Death
Is strict in his arrest) Or I could tell you
But let it be : Horatio, I am dead,
Thou liv'st report me and my cause aright
To the unsatisfied.

হ্যামলেটের সমালোচককে অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে হোরেশিও হতে হবে। প্রুফ্রক বলে ওঠে—"It is impossible to say just what I mean !" পরবর্তী কয়েকটি লাইনে প্রুফ্রক যদি তার বক্তব্য না বলত, তাহলে এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে যে সব তুলনামূলক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তা গ্রাহ্য হত না এবং আকস্মিক বিবেচিত হোত। কিন্তু তার সবটাই আকস্মিক নয়, কারণ আলফ্রেড প্রুফ্রক আবার বলে···

No. I am not Prince Hamlet, nor was meant to be ;
Am an attendant Lord, one that will do

To swell a progress, start a scene or two,
Advise a prince ; no doubt, an easy tool,
Differential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous ;
Full of high sentence, but a bit obtuse ;
At times, indeed, almost ridiculous
Almost at times, the fool.

পলোনিয়সের সঙ্গে সাক্ষাতকারের পর হ্যামলেট বলে—"These tedius old fools"—আবার বন্ধু সম্পর্কেও সেই একই বিবরণ, বন্ধুর কন্যা ওফেলিয়াকে বলা হয়েছে—Let the doors be shut upon him, that he may play the fool nowhere but in's own house."—একটি দিক অবশ্য এড়িয়ে গেছে এলিয়েটের চোখে হ্যামলেটের 'ফুল' হ্যামলেট স্বয়ং, সেক্সপীয়রিয় সংজ্ঞা অনুসারে 'ফুল' অর্থে বোঝায়—

"He uses his folly like a stalking-horse and under the presentation of that he shoots his wit." (As you Like it)

সেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডিতে পলোনিয়স সম্রাট ক্লডিয়াসের মিত্র এবং প্রুফ্রক প্রিন্স হ্যামলেট হতে চান না ; এমন কি হ্যামলেটের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করাতেও আপত্তি।

"Hamlet is of the fiction that is wronged"—এ ছাড়া অন্য রকমের বিরোধও আছে, পিতা, বি-পিতা, খুড়া, অর্থাৎ যাঁরা সব পুত্রদের এবং পুত্র স্থানীয়দের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারেন তাঁদের সঙ্গে। প্রুফ্রকে তাই প্রুফ্রকের সঙ্গে এলিয়ট এর একাত্ম না হওয়ার প্রচেষ্টা তেমন প্রবল নয়।

এলিয়টের উক্তির সঙ্গে গ্যয়টের হ্যামলেট সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অতি নিকট সাদৃশ্য বর্তমান। গ্যয়টের "Wilhelm Meisters Lehrjahre" নামক গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের (কার্লাইল কৃত অনুবাদ) মধ্যে কয়েকটি মূল বক্তব্যে বেশ মিল আছে, গ্যয়টে বলছেন সেক্সপীয়র হয়ত "misled by the novels, which furnished him with his materials."

এলিয়ট বলছেন

"The Hamlet of Shakespeare will appear very differently if, instead of treating the whole action of the play as due to Shakespeare's design, we perceive his Hamlet to be superimposed upon much cruder material which persists even in the final form."

উভয়বিধ যুক্তিই স্পষ্টভাবে না হলেও প্রচ্ছন্ন ভঙ্গীতে সেক্সপীয়রের লিপি দক্ষতার ত্রুটী নির্দেশ করে। গায়টে এবং এলিয়ট দুজনের বক্তব্য একটি মূল বিষয়ে প্রায় এক, উভয়ে বলেছেন নাটকের মধ্যে যেটি হয়ত উপযুক্ত সন্ধানসূত্র তাকে বর্জন করতে, কারণ এইসব দৃশ্যে উদ্দেশ্য বা মোটিভ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এলিয়ট বলেছেন—

And finally there are unexplained scenes—the Polonius-Reynaldo scenes—for which there is little excuse, the scenes are nor in verse style of kyd, and not beyond doubt in the style of Shakespeare." এর বেশী আর বলা হয়নি।

Family Reunion-এ হ্যারী তার স্ত্রীকে হত্যা করে সে তার মার প্রতীক, তারপর মাকে হত্যা করে সে তার বাপের প্রতীক। এই যে ঘটনা সংস্থাপন তা হ্যামলেটের অনুরূপ। তবে মূলতঃ আবার বিপরীত। হ্যারী বাড়ি ছাড়তে চেয়েছিল, তার ফলে মার মৃত্যু। হ্যামলেট বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল, সেইখানেই তার সমস্যা, তার ফলে প্রথমে তার নিজের মৃত্যু, তারপর সম্রাটের হ্যামলেটের গৃহে প্রত্যাবর্তন সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে এক মহৎ চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। হ্যারীর বিদায়ের ফলে তার সমস্যার সমাধান হয়নি। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট এইভাবে বারবার এলিয়টের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

কবিতা ঃ

অতুলরঞ্জন দেব

পাগল

আমি তাকে পেয়ে
বিব্রত বোধ করছিলাম।
কোথায় রাখি ?
কী করি ?
এক জায়গায় স্থির থাকতে পারিনি।
কেবল
ছোটাছুটি
দৌড়োদৌড়ি
লুকোলুকি !
তখন সকলে আমাকে
পাগল ঠাওরেছিল।

জীয়ন-মরণের কাঠি
এখন আমার হাতে।
পাগলের সংসারে এখন
কবিরাজ একমাত্র আমিই।
ওষুধ করি, অসুখ সারাই
কিংবা
প্রয়োজনবোধে কারো কারো বাড়াই-ও
হাঃ—হাঃ—হাঃ—ঈশ্বর !
শেষাবধি কি তুমিও পাগল হলে ?

অনন্ত দাশ

বসন্তের হাওয়া দিলে

বসন্তের হাওয়া দিলে করতলে রক্ত ঝরে পড়ে
জানালার শার্সিগুলো ভেঙে যায়
জীর্ণ বুকে বজ্রপাতে
আমার ব্যর্থতা, ক্ষোভ ফুটে ওঠে বিষণ্ণ আকাশে

এখন বসন্ত মানে প্রতারণা হৃদয়ের কোষে
সঞ্চিত আয়ুর ক্রমক্ষয় ; তাই
পৃথিবীর হৃদপিণ্ড ভেঙে উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি ছোটে
সমুদ্রে শোণিতে একাকার।

ভ্রূভঙ্গে ঢেউয়ের নাচে উথালপাথাল বনভূমি
চোখের পরাগে একী হাসি
কিসের সংকেত তুমি তুলে ধরো অপরাহ্নে, জলে
পাখার ঝাপটে
অন্ধকার কোণ থেকে ঝুল ঝরে পড়ে
ধমনীপ্রবাহে শুনি সমুদ্রের ডাক।
রিক্ত ললাটের রেখা প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে ওঠে
সুদূর মাস্তুলে জ্বলে বিষণ্ণ নক্ষত্র সারারাত
প্রতিটি নিঃশ্বাসে
বুকের গভীর থেকে রৌদ্রের পালক ঝরে
অবেলায়, অসময়ে এমন বসন্ত হাওয়া দিলে
করতলে রক্ত ঝরে পড়ে।

অনুপম দত্ত

বীক্ষণ

১

পাশা খেলা হতে হতে প্রশস্ত সভায়
হাততালি বেজে ওঠে। সমাজসংস্কার সব জমা রেখে চৌদিকে সহসা
আত্মগোপনের পণ, তবু অফুরাণ সাড়ি নদী থেকে বৃক্ষ থেকে দূরে
অলক্ষ্য অদৃষ্ট থেকে হু-হু করে এসে যায়। রৌদ্রের প্রতপ্ত
পাশাগুলি শূন্যে কোথা প্রান্তরে বিলীন।
পাশাখেলা হতে হতে আকাশে ভীষণ
ঝড়ের পতাকা ওড়ে।

২

রৌদ্রের অস্থির দৃশ্যে চারিদিকে করতাল বেজে ওঠে।
অশক্ত হলুদ জরা ইতস্ততঃ ডালে ডালে কম্পমান।
হাওয়ার করতাল বাজতে বাজতে দূর দিগন্তসীমায় দাবানল।

তবু বৃক্ষগুলি স্থির, কিশোর পাতার মুখে সুভাষণ!
আগুনের এই অর্ঘে দৃশ্যের কাকলি স্ফুট চারিদিকে
যেহেতু সজলগন্ধ মাটির তলার পায়ে ছড়ান জ্যোৎস্না অবিরল।

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিভাস

স্থির নিশ্চল মস্ত এক দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে আছে এক
বিরাট গাছ, যে গাছের পাতায় পাতায় সবুজের শ্যাম সমারোহ, সারাদিন
ধরে সেখানে নানা দৃশ্যের মিছিল ; সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছ
ঝিমোয়, পাখীরা গুঞ্জন করে ডালে ডালে।
মাটির ভেতর গাছের শেকড় চলে গেছে চারদিকে, পাতাল
পর্যন্ত রাস্তা করে ; উপরে নিচে তার প্রসার।
বিরাট তরুর ব্যাপক সমারোহ, আকাশ ছোঁয়া তার বিস্তার।
স্নিগ্ধ শীতল মমতার ছায়া বিছিয়েছে সেই গাছ, এই পরিবেশ লোককে
আকর্ষণ করেঃ কবি এল কবিতাও এসে পৌঁছুল ;
দু'জনের পরিণয় বন্ধন হ'ল গাছের ছায়ায়।
শত শত বাদ্যযন্ত্র এখানে অদৃশ্যে বাজে,
মোহমন্ত্রের মৃদু গুঞ্জন এখানে, মুগ্ধমন এখানে অভিভূত হয়।
গন্ধে বিভোর হয়ে এখানে সাপ আসে,
আনন্দে বিহ্বল মণিকণ্ঠ ময়ূরেরা এখানে সুখে আনন্দে নাচতে আসে।

জটাধারী শিব যেমন গঙ্গার ধারা
ধরনীর দিকে বইয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি এই

বিরাট গাছের অসংখ্য ডাল পালাকে আশ্রয়
করেও যেন জলধারা মাটির বুকে নেমে আসে।
যখন মহাপ্রলয় আসে সব কিছু বন্যার জলে ভেসে যায়,
উপরে নীচে চারদিকে শুধু জল, যোগীন্দ্রের মতো এই
অক্ষয় অমর বটবৃক্ষ স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রলয় বর্ষণের জলে স্নাত হতে।
মনে প্রথম যে ব্যথা জাগে, সে ব্যথাকে কখনো স্থায়ী বলে মানতে নেই,
যে মনে প্রথমেই শোক আসে, আসে দুঃখ, তা
নিতান্তই সাময়িক, মানুষের মন, ব্যর্থ, উদাস,
এই ভাবেই প্রতিদিন প্রভাতের আলো ফুটে উঠে, রাতের অন্ধকার
কেটে গিয়ে নতুন আলো দেখা দেয়।

সব সময়েই চাই আত্মত্যাগ,
দুঃখী আত্মা মরুভূমিতে বিলীন হয়ে যায়। প্রথম শোনা
ধ্বনিকে কেউ বন্ধ করতে পারে না। প্রথম
দুঃখকে মেনে নিও না, দুঃখেই জীবন গড়া।
দুঃখপূর্ণ নশ্বর জীবনে মৃত্যুই হল সঞ্জীবনীরসের
আধার। জীবন বলি না দিলে অমর হওয়া যায় না।

গাছে গাছে চিকণ সবুজ পাতায় কেমন করে
নতুন আলোর স্পর্শ লাগে। একটু মনোযোগ
দাও, দেখতে পাবে আলোকেরই জয়।
প্রথম শোককে মানতে নেই, তাই হল
বীরতের দ্যোতক তাতেই হয় জীবনের সার্থক বলিদান।

এই অদৃশ্য লোক পরম সুন্দর আর মনোরম আর
অন্তহীন সুরে সংগীতে ভরপুর।

পশ্চাৎগামী ছায়ার মতন

আজানের সময় হলেই
পীরের দরগায় মানত করা মন,
উবু-হাঁটু বসে পড়া সূর্যের মতন,
ফিরে আসে পশ্চিম দরজায়।

স্বয়ং ঈশ্বর আমি যেন—
সান্ধ্য-অবসানে মহা-সঙ্গতী আয়োজনে।
ভালবাসা পশ্চাৎগামী ছায়ার মতন,
সাত দিনে হামাগুড়ি পায়ে-পায়ে,
পলি-মাটি দেশ ছেড়ে ফিরে আসে একদিন!

রাত্রির সিঁড়ি ভাঙ্গা পথ শেষে এইবার,
হৃদয় আমার, পলাশের রক্তিম-শাখায়।

অমিতাভ দাস

বড়ো অসহায়…বড়ো মাতৃহীন একা

একেকদিন চোখের জলে বুক মাড়িয়ে মনে হয়
নীরন্ধ্র পোষাক ছিঁড়ে ঘরে ফিরি
সহজ সিঁথির মতো চেনা পথ এখন কুয়াশায় ডুবে আছে
ঠিকানাহীন ভুল খামের মতো অজস্র তারিখ চিহ্ন কণ্টকিত বিক্ষত বিলাপ
চতুর্দিকে অলীক নির্মাণের নামে সূর্যাস্তের কালো পাঁচিলে দাঁড়িয়ে
কারা যেন পরিণামের নিশান ওড়ায়
ঘরে ফেরার শেষ খেয়া কোন্‌দিকে আমার মায়ের মতো বসে থাকে?
ঝরাপাতাময় ছিন্ন কণ্ঠনালীতে অবস্থিত বিষাদ আমার সর্বস্ব হারানোর
নির্ভুল হিসেব খুলে নিয়তির অনিদ্র তিমির বসে আছে
নেপথ্যের অগ্নিকাণ্ডে বিরল ছায়াবান বৃক্ষ পুড়ে যায়
আমি ভাঙ্গা নৌকোয় ডুবে যেতে যেতে আঙ্গুল কাঁপানো স্মৃতি সমুদ্ধ
শৈশবের শীতকালীন জননীর করতল খুঁজি
বড়ো অসহায়…বড়ো মাতৃহীন একা।

আনন্দ বাগচী

মধ্য দুপুর

এখন শুধু মাথার মধ্যে রাগী বোলতা
ঘুরছে ফিরছে অন্ধ পাখায়
এখন শুধু মগজ জুড়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরছে
এর সাথে তার তার সাথে এর কয়েক মিনিট
তারের বাঁধন,
পোড়ো বাড়ির ভিতের মধ্যে মধ্য দুপুর
শূন্য মাথায় শব্দ করে বৃষ্টি পড়ে
কাকের ডাকে চমকে ওঠে চিলেকোঠা
বিজুলী তারে খতম্ ঘুড়ি, বাদুড় ছায়া
অলক্ষুণে ভয়ের মত ঝুলেই আছে।
এখন শুধু মাথার মধ্যে অন্ধ পাখায়
জ্বলন্ত এক হলুদ বিন্দু
ঘুরে বেড়ায়॥

উদয়ন ভট্টাচার্য

অন্য পুরুষের কাছে

এখনও আজ্ঞাবহ এই সেনাপতি
রাজত্ব রাজ্যপাট ছেড়ে নিম্নমুখী হ'য়ে
আপাততঃ সফল বটবৃক্ষের কাছে
প্রার্থিত সম্মান নিতে আগ্রহী।

কিন্তু জন্মান্তরে সামাজিক প্রভুত্ব এনে
যে পেয়েছে সুযোগ্য সম্মান
পরিণামে সে ভিক্ষুক হ'তে চাইলে
আজ তাকে আমি যুদ্ধসাজ খুলে
দাঁড়াতে বলবো—

প্রিয় ফুল তার বুকে এনেছিলো মমতা
সুদিন তাকে দিয়েছিল শৈশব,
ভালোবাসার অর্থ জানতে চেয়ে
যে পেয়েছে সরোবরের মত গভীর নারী
রাজ্যপাট না ছেড়েই
নতুন আশ্রয় চাইলে
পরাজিত মনে ক'রে
তাকে আমি রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়ে যেতে বলবো।

কমল সাহা

বন্দীর নিবেদন

সতীর্থের রক্তমাখা বেয়োনেট হাতে নিয়ে
ওরা গতকাল রাতে আমার সমস্ত ঘর সার্চ করলো
অনেক নিষিদ্ধ দ্রব্য খুঁজে পেয়েছে
এবং এই অপরাধের জন্যে আমি এখন বন্দী—বন্দী।

ঘরের গোপনতম অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছিলাম
মানুষের জন্যে অমল ভালোবাসা
বিপ্লবীর জন্যে ধারালো সমর্থন
এবং সকলের জন্যে আমার সহস্র বেদনা, ঘৃণা।

আমি তো বন্দী হয়েই আছি
প্রেম যদি অপরাধ হয়
আজীবন সশ্রম দণ্ডভোগ করবো
শুধু মাঝে-মাঝে নিষ্পাপ গভীরতম আকাশ দেখতে দিও
মায়ের চোখের জলে ভাইয়ের অশ্রুতে, রক্তে, ঘামে
দ্রবীভূত মাটির ওপরে রিক্ত ঘাস
স্পর্শ করতে দিও।

কমল চক্রবর্তী

অরণ্য-কস্তুরী

একদিন নিয়ে যাবো
যেখানে দীর্ঘকাল অরণ্য-কস্তুরী নিয়ে খেলা
প্রকৃত পুরুষ এলে কিভাবে পাহাড় ঘুমোয় ভারহীন
মানুষ ছড়িয়ে রাখে গাঢ় ভালবাসা
কুসুম ডিহির পথ গাছপালা মিঠাই ঝরণা
যাদের শরীরে হাত বিখ্যাৎ হাওয়ার রাত ভাসে
নেটের মশারী ঢাকা সরল শরীর
নীলাভ কুয়াশা ওড়াউড়ি
ব্যাথার টংকারে ফোটে শীতের বকুল মাঝ রাতে

ভালবাসা পেলে নদী বয়ে যায় সুবর্ণরেখা
তারই পাড়ে শরীরের খেলা, জল ছুঁয়ে হৃদয় শপথ
গভীর ছায়ার দেশ, অর্জুন, আসন ঝরে, ঝরে ফুল হয়ে
ধূসর শাড়ীর ফাঁদ দূরে ফেলে শুয়ে থাকে এখানে সময়
জ্যোৎস্নায় আখরোট ফুল অবিকল তোমার মতন

তোমাকে দেখাবো সব
কীভাবে শহর ভুলে বহুদিন আছি

কুমারেশ চক্রবর্তী

বাইশের বসন্তে

পুরোন স্মৃতিকে কল্পনায় এলিয়ে ফাঁপিয়ে
রোমন্থন করে রাত কাটাতে আর ভালো লাগে না।
ভালো লাগে না তোমার কথাভেবে
ফাঁকা ট্রাম ছেড়ে পথ হাঁটতে।
বিশ্বাস কর, আর ভালো লাগে না
বালিশের বুকে বুক রেখে
পিন-আটা বই-এ মুখ লুকাতে।

এখন এই বাইশের বসন্তে
ছবি কিংবা স্মৃতি নয়
ইচ্ছে হয় তোমাকে কাছে পেতে,
তোমার উষ্ণ ঠোঁটে ঠোঁট রেখে
নরম বুকে মন হারাতে।

গোলাম সাবদার সিদ্দিকি

ভিয়েতনামের মানচিত্রের মত

সূর্যের রঙে রাঙানো
তোমার মানচিত্রে
হে বাংলা
আমার বোনের উলঙ্গ
বুলেট-বিদ্ধ লাশটা পড়ে আছে
ভিয়েতনামের মানচিত্রের মত

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকিত বিসর্জনে ভিখারী করেছো

আলোকিত নাভিমূলে কিভাবে
মোমের বিবৃতি এনেছো
দীর্ঘকাল চিরায়ত অলৌকিক স্বপ্নের ভিতর
শরীর ছুঁয়ে থাকবো কতকাল
সৌধ দেখো কিভাবে
ভেঙে ভেঙেই পড়ছে
আত্মবিসর্জন ভেবে অনাস্রব বিষাদে সামিল
তা'হলে
নীলপদ্ম করতলে তুমিই যৌগিক প্রতিমা
সেই মন্ত্রে
আমাকে ভিখারী করেছো

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

নির্বাসন থেকে

অসম্ভবের দুঃখ নিয়ে বেঁচে আছি বেশ কিছুকাল।
খুব কেঁদেছি, বিলাপরত, নীল করেছি শরীরটাকে।
মর্ত্যভূমির খেজুর ছায়ায় পাপীর সঙ্গে আমার আলাপ।
মগ্নরোদে দিলাম সাড়া, সেই মুহূর্তে, তোমার ডাকে।

মনে পড়ে, অসুখ থেকে সুখের মধ্যে ফেরার সময়
জাদুকরের মোমবাতিটা নিবিয়ে ছিলাম গুহার মুখে।
দৃষ্টি ফিরে পাবার আশায় সবুজ চশমা পরেছিলাম।
অতর্কিতে রক্তে আমার ভয়াবহ দৃশ্য কাঁপে।

পাগলা হাওয়ায় উথাল পাথাল, আয়না-ভাঙা ঘরের মধ্যে
একটা অন্ধ দেয়াল মাপে, রক্ত দিয়ে লিখে রাখে ঃ
'কারাগারেই জন্মেছিলে,
বন্দী তোমার পুনর্বাসন
পারাপারের সেতুর ওপর, কয়েক বছর রাত্রিযাপন'।

জয়ন্তী সেন

তোমাকে দেখাবো মুখ

ভেবোনা তোমাকে আমি আবার ধূসরে
ফিরে চলে যেতে দেবো,
একবার আলোর চমক
শব্দের সিঁড়িতে জেবলে ঘরে ডেকে এনে।
ঘর কি আদিম গুহা, তমিস্র, নিবিড়
সূর্যহীন পরিবেশ নয় ?
এসব প্রশ্নের তীব্র ধারালো পাথর
শাণিত উত্তুঙ্গ ভাষা বিদ্ধ করো বুকে,
রক্তাক্ত হবার জন্যে আমিও প্রস্তুত !
বিদ্যুতে ব্যাহত হলে অনায়াসে মোমবাতি জেবলে
তোমাকে দেখাবো মুখ
কাচে আর আত্মার গভীরে।

জীবন সরকার

দখিনা বাতাস

আমি প্রেমের জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে চেয়েছি
কেয়ার ঝোপে
মালঞ্চের লুকানো কোন সৌরভ।
যার চোখের নীলে ঘুম—
নিঃঝুম।
ঘুঘু ডাকা দুপুরের রৌদ্রময় প্রবঞ্চনায় আয়ু
প্রতি নিয়তই ফুরিয়ে যাচ্ছে
তবু
আমার দু'চোখে
জ্বালিয়ে রেখে নীলার দ্যুতি
রঙ্গন ঝোপের নিবিড় রক্তিম আহ্বানে
সাড়া দিয়ে হৃদয় রক্তাক্ত করি।
যদিও জানি অবুঝ আবন্ধ সুরভির খোঁজে
হারিয়ে যাচ্ছে পরমায়ু
শুনায়ু পাচ্ছে—নিঝুমতার স্বাদ।
অথচ
এইতো—সবে দখিনা বাতাস দিচ্ছে।

জীবনময় দত্ত

অসম্ভব এক ইচ্ছা

অসম্ভব এক ইচ্ছার জালে
আটকা পড়ে গেছি।
বিস্মিত বিস্ময়
আর কিছু পেছনে ফেলে আসা
ছায়া ছায়া
ছবি নিয়ে ভবিষ্যতের
রঙ খোঁজার পালা।

কিছুতেই কিছু হয় না,
যেন নাটকের পর্দা ফেলার
ফাঁকে দু'টান বিড়ি ফোঁকা—
এভাবে তো চলতে পারে না কিছু,
তবুও কি আশ্চর্য ! চলছে সবই
একবুক ইচ্ছা নিয়ে
কারণ
অসম্ভব এক ইচ্ছার জালে
আটকা পড়ে গেছি।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই নির্জন মুখর দিন

ভোররাত্রের প্রথম ট্রেনেই ফিরে আসবার কথা ছিল—ফিরতে পারি নি
সেখানে কেউ নেই কোন জনমানব কোন কলরব মুখরিত বাড়ীর দেয়াল
তবু ভোররাত্রের প্রথম ট্রেনেই ফিরতে পারি নি

খাঁ খাঁ রোদ্দুর চারদিকে
শুধু এক পুরোন মাদারগাছ প্রসারিত বাহু দিয়ে সূর্যকরোজ্জ্বল দিন শুষে নেয়
লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে ঠাকুরমার সিঁদুরমাখা আধুলি পরিচিত হাসি হাসে
বাস্তুভিটের উপর উপড়ে-পড়া সুপারীর দেহ
পাঁচমাথার মোড়ে অশথ বট খেজুর বেল আর নারকুলে কুলের চারা পুঁতে
পঞ্চবটি গড়েছিলেন আমার ঠাকুর্দা
যাঁর সিঁদুরমাখা পায়ের ছাপ বাঁধানো আছে দেয়ালের গায়

বাঁধানো দিঘীর ঘাটে সারাদিন ছিপ ফেলে বসে থাকতে থাকতে
বাটিভর্তি মুড়ি আসত নারকেল কোরা রসওলা কাঠালের কোষ
এখন দোয়েলের চড়ুইয়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই নেই
সিঁদুরমাখা রুপোর আধুলি লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে সশব্দে হেসে ওঠে

ঐকান্তিক

অস্থির চেতনার বিষণ্ণ প্রয়াস ভালবাসা
উধাও মনের সাধে এই বড় কাছাকাছি আসা
গভীর চাওয়ার সুর চোখের পাতায় ছেয়ে থাকে
চেনার সড়কে মন দ্রুত ছোটে অচেনার বাঁকে,
অথচ নিবিড় রাতে অকস্মাৎ ঘুম ভাঙা চোখে
বিবিক্ত নিজেকে দেখি নিভৃত নির্জন এক লোকে—
সব দীপ নেভা রাতে সুনিবিড় বেদনার ঢেউ
ঘিরে থাকে আমাকেই, যখন কাছেতে নেই কেউ।

দিব্যেন্দু পালিত

রাখা যায় না

এমন ছবি খুব বেশিদিন
বুকের মধ্যে রাখা যায় না।
রাখতে গেলে থুবড়ে পড়ে,
দেখতে গেলেই ঘষা আয়না !

ফ্রেম বাঁধানোয় ভুল নেই তো !
শুধরে ছিলাম পেরেক ঠুকে—
একটু-আধটু ঝরলো রক্ত ;
যীশুখৃষ্ট আমার মুখে।

এমনি করেই বাড়লো বয়স ;
জলের মধ্যে দাঁড়ের শব্দ।
জ্যা-বন্ধ পাপ ছিটকে আসে—
একলা বুকের সাহস জব্দ।

এখন জলই আরশি দেখায়,
হাব্‌সি ভাষায় দেদার আলাপ।

বোঝা যায় না এমন মিষ্টি,
ছোঁয়া যায় না এমন ত্রিতাপ !

খুব বেশিদিন বুকের মধ্যে
রাখা যায় না ঘষা আয়না ;
চোখ খুললেই সহজ রক্ত—
ভাসন্ত মুখ দেখা যায় না ।

দীপক দত্ত

একজন মানুষ

দরজার ওপাশে কারা যেন নখ সাজিয়ে বসে আছে
বেরোলেই শরীরে ঝড় বইয়ে দেবে ;
একথা ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর ভেতর গড়িয়ে যায় যুবক শরীর—
সকালের কাঁচারোদ,
ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টিও হার মানে নিঃশব্দ যুবতীর কাছে ।

কাউকে ফেরানো যায় না ঃ মৃত্যু সে তো অবশ্যম্ভাবী গতি ;
দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে যে ঝুলে আছে মৃত্যুর গভীরে
সে-কি আর মৃত্যুকে রিক্ত ফেরাবে ॥

দীপঙ্কর দাস

অক্ষম ছেলেটা

নীলশিরা ওঠা কাঠির মত হাত দুটো,—
দুবেলা ভাত বেড়ে দেয় ।
'আহা ছেলেটা দুটো খাক' বলে,
নিজের ভাগের তরকারিটুকু নিঃশেষে তুলে দিয়ে
শুকনো ভাত নাড়ে ।
নিয়ত ঈশ্বরকে ডাকে—ছেলেটা
বাঁচুক—বড়ো হোক ।
আর অক্ষম ছেলেটা রোজ রাত্রে
বালিশে মুখ গুঁজে, উদ্গত অশ্রু
উজাড় করে দেয় ।

কোথায়, কে জানে

পাতা ভেসে যায় জলে, আমি তাকে নিরীক্ষণ করি,
জলেরই মতন শীতল পাতাটি হয়েছে তাহলে ;
সুমন্দ হাওয়ার টানে ভেসে যাচ্ছে সহজ, সরলে
আমি তাকে চোখ দিয়ে আমি তাকে প্রাণভরে দেখি
যেন হিম অনুভূতি পেয়ে বসে আমাকে এবারে,
শীত-শীত আবহাওয়া এ দারুণ গ্রীষ্মের প্রহরে ॥

এ সময়ে বৃক্ষটিকে জানা থাকলে খুব ভালো হোত
বলা যেত কাছে গিয়ে 'দ্যাখো হে, তোমারি লালিত
একপত্র অনায়াসে বাড়ালো যে বয়স আমার'
যেন এমনি ভেসে যেতে ইচ্ছে হয় আমাদের, সবার

সুমন্দ হাওয়ার টানে শীত-বুকে কোথায়, কে জানে !

নগেন্দ্র দাশ

কখন বলেছ বলো

কখন বলেছ বলো বিস্মৃতিতে হারিয়েছ গান
রক্তাক্ত বাতায়নে
অবসন্ন মধ্যাহ্নের রোদ
সে-সকাল নিঃশেষিত
সে-বাতাস বহুদূরে
নিষ্কম্প পল্লব
কেবল ধবল দুধে সিক্ত বুক শস্যময় ক্ষেত
এখনো শ্রাবণ-ভাদ্রে পরবাসী গেয়ে যায় গান
আবর্তিত গল্পসল্পে
অর্থময় কাজে
বুকছেঁড়া রক্ত নিয়ে শস্যেরা সোনালী হয়ে ওঠে
পাখিদেরও রক্তে ফোটে শস্যের সংবাদ

অথচ তোমার গান
চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে
কবে গেয়েছিলে
নির্বাপিত কথা শুধু ভেসে যায়
হাওয়ায়-হাওয়ায়

পলাশ মিত্র

কোনো এক জননীর প্রতি

বুকের ভেতর ছোটো নরম শিশু
তবুও তুই কঠিন কঠোর কেন
শিশুর ছোঁয়া রোজ নিয়েছিস মুখে
তবুও তোর কণ্ঠে গরল কেন !

দুঃখে শোকে ভীষণ জীর্ণ তুই
তবুও চোখে জলের বিন্দু নেই
বেঁচে তো আছিস, মরতে কেন চাস
বাগানে আয়, ফুল তো সেখানেই।

পুলক গোস্বামী

কারফিউ এলাকায় এসে

আমি যেন হঠাৎ না জেনে কোন কারফিউ এলাকায়
এসে গেছি। অভ্যস্ত পথ চলতে আকস্মিক
'হল্ট' শুনে চেয়ে দেখি আমার চারিদিকে
সান্ত্রীরা বন্দুক উঁচিয়ে। আমি ত্রস্ত দু'হাত
উপরে তুলে অসহায় চেয়ে দেখি এদিক ওদিক।

পূর্ণ আস্থায় এগোতে এগোতে হঠাৎ চাকরীতে
আসে চার্জশীট। ভালবাসা বিবাহের দরোজায় এসে
হঠাৎ তর্জনী তোলে কারণ না রেখে। বন্ধুতা
ইদানীং আমাকে অস্পৃশ্য ভেবে নিয়ত এড়ায়।

সমস্ত দরোজাগুলো একে একে বন্ধ হয়। আর
আমি নিশ্চিন্ত পা ফেলে এসে হতবাক হই।

তাই এখন আমি সর্বদাই সন্ত্রস্ত পথ চলি—
কি জানি কখন কি হয় কারফিউ এলাকায় এসে॥

প্রণব মাইতি

তবুও ছবির স্মৃতি

সব ছবি, ছবি থাকে, থাকে না অনেকে।
এবং আমার কাছে অনেক ছবির স্মৃতি
বাল্যের উঠোনে টানে টুকরো রোদ্দুরে
যেখানে খেজুর রসে মৌতাত জমে ওঠে
ঠেলাঠেলি ছায়ারোদে আড়াল আবডাল।

সব ছবি, ছবি থাকে, থাকে না সবাই
মনে পড়ে যায় দূর, বিষণ্ণ রৌদ্রের রং
জুনপুটে অস্তাচল—হাঁটছি আমরা।
ধানক্ষেত শুয়ে থাকে হিমে পিঠ পেতে
শুটকী মাছের গন্ধে, অন্ন-প্রাশনের স্মৃতি
ছোট ছোট জেলে বাড়ী সুখের সংসার।

অথবা, একটু পরে
সমুদ্র সৈকত থেকে শ্মশানযাত্রীর দল নগ্ন পায়ে
ফেরে।
তখনও ছবির মত ম্লান অস্তাচল নিয়ে
এ সকলই ছবি, তবু ছবি নয় মোটে।
স্মৃতিকে জুটিয়ে এনে ছবির মতন।

প্রতিমা সেনগুপ্ত

টফি

তোমার ছেলের হাতে একটা রাংতা ধরিয়ে দিয়ে
ভেতরকার টফিটা খুলে নিয়েছ,
কারণ জানো যে—
ঐ মিথ্যেটুকুর চমক দিয়ে ওকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে।
কিন্তু ও বুঝে ফেলেছে তোমার হৃদয়ের ফাঁকিভরা ভালোবাসাটুকু
বুঝেও—
কেমন দিব্যি খেলে বেড়াচ্ছে দেখ ঐ রঙিন চালাকির
চমকটুকু নিয়ে
আর সেই সাথে—
তোমাকেও কেমন খেলিয়ে নিচ্ছে এক হাত মিষ্টি হাসিটুকুতে

বিনয় মজুমদার

কলকাতায় থাকার উপায়

রেলের লাইনে ছেড়ে ডান হাতে নেমে পড়ে মিনিট পাঁচেক হেঁটে এলে
এই যে নিকুঞ্জমতো মনে হয় ওইখানে আসা যায় আম লিচুভরা
বাড়িতে বিস্মিত হয়ে থাকা যায়, নগরের লিচুগাছে আমগাছে কোনো
ফলই ফলে না, হায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের মাঠে আমগাছগুলি এরূপ নিষ্ফলা।
তবে সত্য কোনখানে, গ্রামের বাগানে না কি নগরের পথে পার্কে মাঠে ?
তার মানে ফল ফলা নিসর্গের নীতি, না কি না ফলাই প্রকৃত বাস্তব ?
কাউকে জিজ্ঞাসা আমি করি নি তো, দেবদারু গাছ কিম্বা তারাকে করি নি
কারণ নিশ্চিতরূপে জানি ফল না ফলাই যথাসত্য, ত্রুটিরূপে ফল হতে দেখি।
অনেক গ্রামীন ত্রুটি এইরূপে ধরা পড়ে, প'ড়ে যায় নগরের নিখুঁত নিরিখে।
এইখানে গ্রামে থাকি কদাচিত নগরে যাই কারণ পাই না খুঁজে মৃত দোপাটিকে।

বিমল দেব

সোনার আংটি

বেঁচে থাকার কথা মনে পড়লেই চোখে
ভাসে ভারবাহী পশুর ছবি। প্রেমের প্রাকৃতিক
রূপ আজ আর স্পষ্ট নয়। সেই সব ভালোবাসা
সজীব মাংসল দেহে। সারারাত পেরিয়ে
বিধ্বস্ত বিছানায় পড়ে থাকে শুধু
খোঁপার করবী !
এই সময় মনে পড়ে, কৈশোরের প্রথম টুর্ণামেণ্ট।
জলতরঙ্গের সুরে বকুলের কথাবলা, ধানক্ষেত পেরিয়ে
দূরের আকাশ
সন্ধ্যার নীলাভ রশ্মি, পাখির পালকের সশব্দ পতন
যেখানে রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডে রামধনু রঙ···এইসব।
মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে দিদিমণি বলতেন ঃ
'তুই আমার সোনার আংটি'।

আজও আমি সোনার আংটি, দ্বিখণ্ডিত
রক্তের মানুষ, অবিনয়।

বিশ্বনাথ ঘোষ

একান্ত রক্তের ইচ্ছায়

একান্ত রক্তের ইচ্ছায় স্বাভাবিকতা পথ পায়।
একান্ত রক্তের মাতনে সমস্ত গোপনীয়তা খুলে যায়
দুরন্ত দুপুর
ঘোরালে ফেরালে
চাবি
যৌবন নিষিদ্ধ সড়কে ছোটে দ্রুত অশ্বারোহীর মতো লাগাম বিহীন
স্বেচ্ছামৃত্যু রুমাল নাড়ে আহা, বমনে ও তীব্র বিষে।

আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
প্রেম নিয়ে রাহাজানি করে সব মেধাবী যুবক
এবং আশ্লেষে রঙিন ঘুড়িতে ওড়ায়
স্বপ্ন সাধ
একান্ত রক্তের ইচ্ছায়—সমস্ত গোপনীয়তা।

বীরেন মিত্র

মুঠোভরা কিছুটা সময়

আলেখ্যের সুনির্মল স্বপ্নকিছু
উষা আর আকাশের নীলে
আবির্ভূত হয়ে ছিলো
মানবী, দানবী কিংবা দেবী—
নীলাঞ্জনা
ঘন অগ্নিশ্বাসে—
যায় নাই চেনা

•

অসীম লাবণ্যধারা
বিকশিত উৎপলিনী
স্পর্শে গন্ধে
দিয়েছিলো ধরা
উর্ব্বশী—সোনালী বাসরে
রঙে রসে সুরভিত ঘ্রাণে
তৃপ্ত নীহারিকা

মুঠোভরা কিছুটা সময়
অনন্ত ব্যাকুল
সীমাহীন।

স্বীকারোক্তি

আমি জানি,
যে মাটির ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি
কোটি কোটি বছর ধরে কোটি কোটি প্রাণী
দাঁড়িয়ে থেকেছে সেই একফুট জায়গার ওপর ;
আর কোটি কোটি বছর ধ'রে
শত শত প্রজন্মের প্রাণী এসে দাঁড়াবে সেখানেই।
যদি কেউ চায়
এখনো আমি এক পা তুলে নিতে পারি
তার পা রাখবার জন্যে।

আমি জানি,
যে নিশ্বাস আমি টানছি তা বেরিয়ে এসেছে
কোটি কোটি ফুসফুস থেকে,
এবং আমার নিশ্বাসও আমি মিলিয়ে দিচ্ছি
কোটি কোটি ধমনীর রক্তস্রোতে।
আমি জানি,
কোটি কোটি মানুষের মুখ থেকে পেয়েছি ভাষা,
আর আমিও তা রেখে যেতে চাই অন্যদের জন্যে।
মানুষের সংসারে মানুষের ঘরে জ'ন্মে
আমি কীই-না পারি মানুষের দরকারে !
আমার ভাতের থালা আমি ভাগ করে নিতে পারি
অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে ;
দিতে পারি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে
আমার শরীর থেকে একশো সি সি রক্ত,
আমার চোখদুটি থেকে ভাগ করে দিতে পারি
এমন কি একটি চোখের কর্ণিয়াও।
কিন্তু ভাগ করে নিতে পারি না অন্য ব্যক্তির দরকারে
তোমার সঙ্গে রচিত আমার এই ভালোবাসার স্পন্দন।
—কেননা হৃদপিণ্ড আমার একটিই,
তাকে দ্বিখণ্ডিত করা চলে না !

মৃণাল বসু চৌধুরী

ছায়া

ছিল না আগুন তাই ছায়া
মন্দিরের সিঁড়ির ওপরে
অস্পষ্ট পায়ের ছাপে কোলাহল
ডাকাটাকটের রঙ
ছবি

গরম নিঃশ্বাসে তবু
অসাড় জিভের নিচে
লোভহীন কেঁপেছে পারদ
ক্রমশ মাটির কাছে ঋণ
আত্মগোপনের মানচিত্র
ইন্দ্রজাল
সঙ্গীর অভাবে এই ছায়া

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দেবেনা কিছুই দেবেনা

কথা ছিলো কিছুই দেবে না চকমকি পাথর ঘষে নীরন্ধ্র তিমিরে দেখাবেনা পথ
দেখাবেনা হাতের তালুতে বিন্ধ অবশিষ্ট অমা
দেবেনা কিছুই দেবেনা
বাঁকানো ঠোঁটের এই মোহন তরণী জুড়ে মৃত্যুর মতোন অমলতা দেবেনা
দেবেনা অমোঘ স্বর তীক্ষ্ণ তূণ আশ্চর্য তূণীর
আভূমি লুণ্ঠিত মুগ্ধ বকুলবীথির তলে ঝরাবেনা ফোটা ফোটা মৃত্যু জ্যোৎস্নার
অথচ কথা ছিলো
গলানো সীসের মতো উজ্জ্বল রুপোলি দিনে বিন্ধ করবে বুক
সান্ধ্যপদব্রজে আমি সেই থেকে একা
আমি একা উদাসী বাউলের মতো রয়েছি প্রস্তুত

দুয়ারে কে তুমি দূত
শীত তাপ মুক্ত রক্তে কে বাজাচ্ছো মৃত্যুর মোহন ঘন্টা
দ্রুত শব্দে কড়া নেড়ে কে আমাকে এতদূর এনেছো স্মৃতির
এনেছো বিষাদ মলিন এই সুদীর্ঘ সাঁকোয় শোক ছিলো শোকের গভীরে
অমল দ্রাক্ষার মতো থোকা থোকা দুঃখ জমা ছিলো ঠিক দুঃখের মান্দাসে
কী করে দেখাই দুঃখ অমলতা
বলকুবীথির তলে ফোটা ফোটা ঝরানো মৃত্যুর জ্যোৎস্নায়

দেবেনা কিছুই দেবেনা
বিষাদ বিষাদ শুধুই বিষাদ খেলাচ্ছলে
বুকের ভুবন নেড়েচেড়ে তুমি কী এই সান্ধ্যপথে কিছু দেবেনা কিছু দেবেনা

মৃণাল চট্টোপাধ্যায়

জমে থাকা স্তূপীকৃত

হঠাৎ কেন বুকের মধ্যে খচখচানি !
কম বয়সী যুবক সে যে কাঁধে করে
অতীত স্মৃতির ইঙ্গিত কি বহন করে—
চলতে চলতে হঠাৎ কেন থেমে গেল ?

থেমে গিয়েই ভেসে ওঠে সময় সময়
মনের কোনে জমে থাকা স্তূপীকৃত—
হঠাৎ কেন উৎসারিত স্রোতধারা
কি আশ্চর্য ! জমে থাকা স্তূপীকৃত !

ফুলের মালা গলায় পরে শোভাযাত্রা !
বর বেশী তো যুবক সে নয়, শোকের মিছিল শব যাত্রা ।

রত্নেশ্বর হাজরা

ভিতরে এসো। ভিতরে—

ঘরে এসো। ঘরে এলে খেলা আর খেলা নয়
অথবা সবটাই খেলা। ঘরে এসো
শূন্যের ভিতর দিয়ে ছায়া হাতে ওঠো যেন দর্শকের মধ্য থেকে
উঠছে যাদুকর। এসো
আকুল বাতাস ক্লান্ত পিপাসার্ত শেষ ঘন্টার আওয়াজ, এসো
শূন্যে আর শূন্যের ভিতরে ছায়া ছায়ার ভিতর
আমার প্রাসাদ যেন সকালবেলার হরিয়াল
উড়ে যায় নিজের ছায়াকে নিয়ে যেখানে যদ্দুর খুশি যেদিকে যদ্দুর
ঘরের ভিতরে তার ছায়া আর ছায়ার ভিতরে শূন্য
শূন্যের ভিতরে খেলা যেন খেলা নয় কিংবা সবটাই খেলা—
ঘরে এসো—ঘরের ভিতরে
যে উড়ে গিয়েছে তার ছায়া…

রঞ্জিতকুমার সরকার

রূপশালী

হাওয়ায় মেলেছে নারী কেশবতী সুগন্ধী রোদ্দুর
মুক্তক ছন্দের মতো, চতুর্দিকে সাজানো বাজারে
লগ্নভ্রষ্ট শ্রোণীদেশ, অনুজ্জ্বল সীমান্তের ঝাউ—
প্রকাশ্য টেবিলে কার নামাংকবিহীন ভালোবাসা
ঘনিষ্ট গৃহের তরে—অথচ যাচ্ছে না ছোঁয়া আর,
নির্ভুল শিঞ্জনে ভাবা যায় নাকো বিগত প্রণয়
ঝাপসা স্তাবক ফটো অথবা ক্ষয়িষ্ণু জলছবি ;
এখানে মসৃণ জ্যোৎস্না পিছলে পড়ে বিশাল উরুতে
হলুদ স্তনাগ্রে আর শায়িত গর্ভিণী নগ্নতায়,
শব্দের অভ্যস্ত মেঘে ঢেকে আছে দূর জনপদ
প্রচলিত অঘ্রাণের প্রতি অঙ্গে রূপশালী ধান।

রফিক নওশাদ

অভিশপ্ত কুসুম ফোটাও

পলাতক পুণ্যশ্লোক আকাঙ্খিত আকাশ উধাও—
দুচোখে নিবিড় রাত্রি প্রেতযোনী বিশুষ্ক কঙ্কাল,
শ্রাবণের অলিন্দে বসে পেখম তো ম্যালেনি ময়ূর,
কণ্ঠে আজ অনুপস্থিত অন্তরঙ্গ সুবাসিত সুর।
আলেয়া চাঁদের বৃত্তে নির্বাসিত রবো কত কাল
অনুর্বর বাগানে সখা অভিশপ্ত কুসুম ফোটাও।

রুদ্রেন্দু সরকার

ভেজা চুলের গন্ধ

সমস্ত দিনটাকে রাত করে দিয়ে
ও মেঘের আড়ালে চলে গেল,
ওদিকে দিন পেরিয়ে সন্ধ্যে হল
কাল মেঘের ধুলো ঝেড়ে
চাঁদ খাঁচার পাখীর মত মুখ বাড়াল,
ওমনি বৃষ্টি এলো—
মনে হল যেন ঠিক ওর ভেজা চুলের গন্ধ
সদ্য শাওয়ার থেকে গা ধুয়ে ফিরল।

শান্তনু দাস

কোন্ পাপে ?

অকস্মাৎ খড়্গ ঝুলে পড়ে মাথার উপর
আমার একান্ত প্রেম ভেঙে পড়ে
বানানো সদর,
জ্বলে যায়—
সাজানো চিতার গায়ে ধিকিধিকি ধিকিধিকি
জতুগৃহে মৃত্যুর বাসরে।

কোথায় আমার ঘর ?
রক্তগর্ভা জননী আমার,
এখনো প্রদীপ নিয়ে বসে আছো দোরে
নিশ্চিন্ত প্রহরে দ্যাখো
জ্বলে যায় বুক,
তোমার বাছার আজ গোপন অসুখ
উপদংশের মতো ছেয়ে যায় প্রতি রক্ত-কোষে।

কোন্ পাপে ভেঙে যায় ঘর ?
কোন্ পাপে আমাদের জন্ম সহোদর
বুকের রক্ত নিয়ে খেলা করে প্রকাশ্য রাস্তায় ?
কোন্ পাপে খুলি উড়ে যায় ?
কোন্ পাপে চোখের জলের পাশে
ঝলসায় সাজানো ইস্পাত।

প্রদীপ নেভাও দোরে, গুঁজে থাকো ঘাড়
তোমার দেহের পাশে আমাদের খুলির পাহাড়
আকাশের মতো উঁচু হয়—
এবং হৃদয় জানি ভোর হয়ে নামবে কোনোদিন,
কখনো বারুদ হয়ে জ্বলবে সময় !

শিপ্রা ঘোষ

বধ্যভূমিতে খুন

হয়তো অনেক কথা বলা যেতো ঃ তবু
হঠাৎ জলের দরে যৌবন বিকিয়ে গেলে তুমি,
নিঃস্বতর শরীর, সুখ, স্বাস্থ্য অনুভব বুঝে নিতে
কাছে এলে ঃ তোমাকে বলেনি কেউ ঃ তবু
লক্ষ্য ছিলো জাদুবলে সমস্ত সংযম
ভেঙে দেবে ঃ স্পষ্ট ছায়া দেয়ালের চতুর সংলাপে।

নোতুন গল্পের মতো হৃদয়ে খুশির ঢেউ তুলে
পালক ঝরানো জলে আলতো আঙুলে মেখে নিয়ে,
দৃশ্যহীন অন্ধকারে ত্রস্ত জনপদ, ভিড়, শীতের সন্ধ্যায় ;
স্বোপার্জিত ভালোবাসা থরে থরে কৌটো ভরা সুখ
সিন্দুকে অসংখ্য মুদ্রা ঃ অতর্কিতে ভাঁড়ারের চাবি
হাতে নিয়ে কাছে আসবে ঃ পলিত জ্যোৎস্নায় সব পাতা
ঝরে গেলে ঃ একা তুমি বিশাল নদীর নীল প্রচণ্ড ব্যথায়,
সমস্ত শরীরে মেখে, বাগানের কাঁটাতার ডিঙিয়ে হঠাৎ
ভিতরে প্রবেশ করবে ঃ লক্ষ্যস্থির
চিত্র বধ্যভূমি।

শিবশম্ভু পাল

পঞ্চশীল

তুমি থাকলে তোমার মতো
আমার মতো আমি
অনাক্রমণ চুক্তি হোক
পঞ্চশীল মানি।

আমি যেন সংকলিত
বিসম্বাদী ভুঁই ঃ
ফণিমনসার পাশাপাশি
স্পর্শকাতর যুঁই।

আমায় নিয়ে বাউণ্ডুলে
ঘুরি শহরময়
শহর মানে স্বয়ম্বর
বিজয়-বিপর্যয়।

তুমি থাকলে তোমার মতো
গভীর উপবনে
নিস্ফলতা পড়ে থাকে
গুপ্ত রণাঙ্গনে ॥

জল চাই

আজ এই অস্তিলোকে বালুসত্তা সৎ !
যে প্রবল আর্তি ছিলো, বুক ভরা তৃষা
তৃষা নিবারণীকাকে, জলের রাণীর কাছে চাই
পানীয়, নিয়তি তুমি যে নিষ্ঠুর প্রাণ বিদারিকা।

ধরা যাক, নাম দিয়েছি যার শুধুই সাগর,
সাগরিকা ! রক্তে আজ ঢল দিয়ে নামে যে জোয়ার ;
ফল্গুধারা বয়েছিলো আমার শরীরে
ঘুমের ভিতরে ছিলো, পেলো আজ দিনের বারতা।

চারিদিকে ধু ধু মরু, উষর গুল্মের ছায়া,
ওই যে উড্ডীন ওই বায়ুনিশানেতে বয় হাওয়া
মধুপর্ণী, দিনে দিনে পট পরিবর্তনের, আবহমানের
দিন গেলো, যে ইসারা ছিলো তবু গুপ্ত কৌতূহলে।

পাগল প্রেমিক হয়ে ছুটে যাই, কোথা জল ?
ইতিহাস চেনে ওই জলের রাণীকে, পা দুলিয়ে
বসে ছিলো টেথিস সাগরে, এলোচুলে
শতাব্দীর অন্ধকার ছেয়ে যায়, আমি কি এখন
গায়ে মাখি আস্থাভাজনের মতো দিনের সবিতা।

বিশ্বজনীন এক মানবিক আস্থা নিয়ে যতো দূর যাই
নিখিল নন্দিত এক আত্মরোল, তাৎক্ষণিক, জলের প্রার্থনা।

আবার ঘুরছে ইতিহাস

সময় রক্তের ক্রমে
আলোড়িত মুখর দামামা।
আচম্বিতে ফুঁসে ওঠে ঢেউ,
যেন কেউ—
প্রচণ্ড তুফানে যুঝে যুঝে
হেঁকে ওঠে,
—সামাল সামাল ভাইসব,
দামাল ঝড়ের ঝুঁটি ধরে
ডিঙিখানা নিপুণ ভেড়াও।

সময় আদিম মোহে
উচ্চারিত অবর্ণ যন্ত্রণা
দীর্ঘবাহু অবক্ষয় রাত
অকস্মাৎ—
ঘুমে ঢোলা যাত্রী শেষ ট্রেনে
চমকে জাগে,
—কোথায় এলাম, অতর্কিতে
গেলাম ছাড়িয়ে
স্মৃতির স্টেশনগুলো ফেলে।

সময় পাহাড় থেকে
পিছু ডেকে অন্তরীক্ষে ঘোর
বিস্ফোরণে ভাঙছে ভূগোল
কুলরোল—
মধ্যযামে গনগনে লাল
সম্ভাবনা
ছুঁয়েছে আকাশ

রুদ্ধশ্বাস মুঢ়বুক জুড়ে
নিহত জ্যোৎস্নার শবগুলি।

সময় দেওয়ালে লেখে
উদ্যত মশাল হাতে যেন।
অর্বাচীন নড়বড়ে সাঁকো
দূরে রাখো।
বিস্ফোরণে টলছে সব মাটি
—সামাল সামাল হুঁশিয়ার,
আবার ঘুরছে ইতিহাস
যুগান্তের শব্দভেদী বাণে।

শ্যামলকান্তি দাশ

বাউল

আমি শুধু কিছুকাল উপবাসে
মাটির আড়ালে রবো, প্রভু
যেমন গড়ায়ে যায় দিনগুলি
সেইমতো আরো কিছু সোনাদিন
ফুরোবে হারাবে
কোনোদিন ঘরভেঙে ঘরের দুয়ারে যাবো, একা
'কয়জন চেনা ও অচেনা মুখ এসেছে বেড়াতে'

মলিন মেঘের মতো আমি মৃদু চেয়ে রবো
হাতে হাতে ভাসমান শূন্য জেগে থাকে!

তোমার পাশাপাশি হাঁটছি

মা,
এখনো তোমার পাশাপাশি হাঁটছি
আজন্ম গর্ভের ঋণ শোধ দিতে নয়
এখনো আমার দামাল স্বভাব
আমি ভালোবাসার ব্যথায় কেবলি
জ্বলে উঠি।

মা,
এখনো তোমার পাশাপাশি হাঁটছি
তুমি কেন এমন ভালোবাসার
রক্ত দিলে!

মা,
এখনো তোমার পাশাপাশি হাঁটছি
আমি ভালোবাসা পেলে,
পৃথিবীর গভীর অসুখেও
একশো' বছর বাঁচতে পারি,
আমার বুকের ভিতর ভালোবাসার রক্ত
জমাট বেঁধে আছে।

মা,
এখনো তোমার পাশাপাশি হাঁটছি
তুমি কেন এমন ভালোবাসার
রক্ত দিলে!

তখনো মনে থাকবে

আমার জীবনটা হোক মরুভূমি
অনন্তকাল অবধি আকাশের চারিধারে
রাত জেগে থাক অথবা
এবং আর যা কিছু আছে— ।
তোমার জীবনকে কণ্টকিত করলাম
সামান্য স্মৃতি, একটু আঘাত ।
বন্ধু তুমি, সুখী হও
তোমার জীবনে আসুক—সুখ আর
মধু গুঞ্জন । তুমি সুখী—
আমার স্বপ্ন স্বার্থক ।
নতুন ভাবে আরও নতুন পথে— ।
ভুলে যেয়ো—আমার মত অপদার্থটাকে
নতুন ঘরে নতুন সাজে
তুমি আর এক জনের আদর নিয়ো,
আমায় ভুলে যেয়ো ।
অনেক কথার ফাঁকে শত কাজের মাঝে
যদি মনে পড়ে একটি নাম
যদি আজকের স্মৃতি এনে দেয় কয়েক ফোঁটা অশ্রু,
জানবো না জানতে পারবো না ।
তবু তুমি সেদিনও আমার আমারই ।
এই কটা দিন আপন মনে
মালা গাঁথলাম সাজালাম ফুলের ডালি
আমারই হৃদয়ের চৌকাটে—
কান্না ভেজা আঁখি দুটি নীরব হয়ে থাক
আপনি বিভোর আপন মনে ।

চোখ হাজারই দরকার

অহল্যা উন্মাদ হোলো আরো একবার
চাষে উদাসীন কালপুরুষ, জীবনবাদ
শিক্ষার্থী তরুণ, আহা, কী পৌরুষ তার
এতেও সন্ন্যাস লাগবে ? বাতাসে প্রবাদ,
ঘী আগুনের পাশে ঘেমে আসে, নারী,
বন্ধ্যার সতীত্ব, ফুঃ, দুর্নাম প্রচ্ছদ
ঘুচবে না কোনোদিন ? অন্বিষ্ট বিস্তারী
প্রখর জীবন তেজ ভরা ধানী-মদ
অস্তিত্ব ছাপিয়ে দেয় পাষাণী—উন্মাদ
বালকে ধর্ষণ করে ঋষির রমণী
তপক্লিষ্ট তপ্ত তনু কী অভিসম্পাৎ
দেবে আর, ললাটের লিখন দেখোনি
পাষাণে শস্যের সজ্জা উগ্রবলাৎকার
ছাড়া অসম্ভব, চোখ হাজারই দরকার ॥

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সেই গভীর অরণ্যে

সেই গভীর অরণ্যে আরো একবার তোমার ঘুরে বেড়ানো শরীর
দেখা গেল ; শীতের বাটিক রৌদ্র সহরের সূর্য থেকে
স্বচ্ছ হতে হতে অবশেষে অভিভূত বনকেতকীর পাতায়
থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ; এখন সে নিজেই মেধাবী ।
তুমি মানুষের প্রিয় প্রতিনিধি ; তোমার দুচোখে
অনেক গম্বুজ, চূড়ো, বিলডিং রয়েছে
তবু গাছের পাতায় মুছে ফেল চোখ
তাকাও গভীর শিকড়ের দিকে । কথা বলো ঐ

মীনকেতন নদীর সাথে, স্নান কর
সম্পূর্ণ গাহন ; শোনা যায় ধ্যান গাঢ় হলেই কেবল
নেমে আসে গন্ধর্বদুলালী, অসম্ভব স্বাস্থ্যে যার
স্বাস্থ্য পায় শ্লোক ; বনের সমস্ত কুমার বৃক্ষের
নাভি থেকে সে সময় ওঠে স্তব, মৌলিক মানুষ
বন থেকে ফিরে টেবিলল্যাম্পের নিজস্ব বিজনে
পুনর্বার সংগ্রশালার হিসাব রচনা করে ; যতক্ষণ না
স্মৃতির ভিতর থেকে উড়ে যায় মাত্র এক, একটিই শালিখ ;
যে শালিখ আজো দুঃখের · প্রবাদে অথবা বাস্তবে।

সাগর চক্রবর্তী

এবং তুমি

ঘরের ভিতর আলনা টালনা আগের মতোই টেবিলে বই
ফুলের দানী ড্রয়ারে পেন হাতঘড়ি আর আঙটি বোতাম
জানলা টানলা রঙিন পর্দা হাওয়ায় তেমনি দুষ্টু চপল
এবং ঘরের বাতাস থেকে ফুরিয়ে গেছে একটা গন্ধ···

মধ্যরাতে কার্ণিশে চাঁদ তেমনি এসে খেলছে কড়ি
হলুদ বরণ কড়ির ঝাঁপি উজাড় করে মধ্যরাতে
নক্সী চাদর ভাসিয়ে প্লাবন···ঘরের ভিতর সবই তো ঠিক
আগের মতো যা ছিলো তাই···কেবল আকাশ
এবং অবকাশকে নিবিড় করে তেমন উপস্থিতি
নেই তো এখন দিনগুলি রাত রাতগুলি সব কঠিন নদী ॥

চোখ-আয়না

বৃথা আয়নায় মুখ দেখা
নিজের মুখের ছাপ বিম্বিত হতে দেখো
অন্যের চোখের মুকুরে
উত্তেজনা ভাব-পাঠে
জানতে পারবে ঠিক
কোথায় বিরাজ কর
কৈশোরে ঊষায় কিম্বা
উত্তেজিত সূর্যের দুপুরে
দৃষ্টির নদীকে যদি হতে দেখো উত্তেজনা হীন
তাহলে বুঝবে তুমি সন্ধ্যায় পৌঁছে গেছ
পার হয়ে দিন
তোমার প্রতিচ্ছবি জলস্রোতে যেন ঢিল পড়া
নদীতে পড়লে ঢিল সহ্য করে
কয়েকটি বৃত্ত মাত্র আঁকে
চাঞ্চল্য ঘটনা নয় জল কেঁপে ফুলে ওঠে
চোখের গণ্ডুষে ফুঁসে জোয়ারের বাঁকে।

সুচেতা মিত্র

আমার সমস্ত পাপ

ঈশ্বরের হাত ধরে
সব রাস্তা হেঁটে এসে দেখি
সমস্ত পথেই কাঁটা
খরতাপ অগ্নিবৃষ্টি জল
সারা দেহ কর্দমাক্ত
রক্তের অঝোর ধারা ঝরে।

ঈশ্বরের সারা দেহ ক্ষতশুদ্ধ
আমারই মতন ক্লান্ত অবসন্ন মুখ।

আমার সমস্ত পাপ বোঝা হয়ে ওঠে
তারই হাতে।

সুদেব সানা

শেষতম স্মৃতি

সূর্য কাঁদলে
সোনা ঝরে
তৃণগুল্মে লতায় পাতায়
শিশির হয়ে আবছা আলোয়
সকালবেলা,

তুমি কাঁদলে
মুক্তো ঝরে
আমার বুকের নির্জনতায়
অশ্রু হয়ে উচ্ছ্বসিত
আবির খেলা ;

শান্ত আকাশ অন্ধকারে
তোমার আঁখি থরো থরো
অশ্রুভারে
নত,
আমার হৃদয়
শুধুই ব্যথাহত।

দেখা হয়নি

নারীকে এখনও ভাল করে দেখা হয়নি
পৃথিবীতে অনেক কাজ বাকি আছে
অনেক যুদ্ধ, অনেক আগুন নিভিয়ে
আলো জ্বালানো
অনেক পথ পেরিয়ে নদীকে খুঁজে পাওয়া
কিন্তু তার আগে এই প্রচণ্ড বাধা
নারীকে এখনও ভালো করে দেখা হয়নি।

এত চুম্বনেও তেষ্টা মেটে না
এত আলিঙ্গনেও অধরা
এই রহস্যময় প্রাণীটি
বারবার আমার চোখ ফিরিয়ে নেয়
পাহাড় ও সমুদ্রের ছবি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে
তার মাঝখানে এই নারীর রূপ
আমি সূর্যাস্ত ও মধ্যযামকে বদলে দিই
মুখোমুখি দর্পণের মতন সংখ্যাহীন প্রকোষ্ঠ
তার শুরু ও শেষে লুকিয়ে আছো, কে তুমি ?
তোমাকে এখনও একটুও দেখা হয়নি।

সুনীল মুখোপাধ্যায়

এক ঝলক রৌদ্র

পায়ের কাছে বাতাসা পড়ার মতন
কেমন টুপটাপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে
আমার লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ
অথবা পাতলুন খুলতে যেটুকু সময় লাগে
সেরকম দ্রুত

কতকগুলো পরস্পর বিরোধী বোধ
আমার মগজ ও মনের ভিতর স্থান অদলবদল করতে চাইছে—
আমি এখন জানালা খুললেই
দারুণ মেঘলাদিনেও সামনের রাস্তায় ও আশপাশের সীমানায়
অদ্ভুত এক রৌদ্রের ঝলকানি দেখি,
যে রৌদ্রে মেঠোবাঁশীর সুর শুনতে শুনতে
ঠিক যেন পুতুলনাচের ভঙ্গিমায় হাসে খেলে
এতকালের সমাজ-খেদানো শিশুসাথীরা—

হেই, আমার মনের ভিতর এ-মুহূর্তে
কেমন এক ঈথারের স্পন্দন—রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌
এইসব শিশুরা আর শালফুলের মতো
স্বেচ্ছায় পদদলিত হবে না।

সুমিতকুমার ঘোষ

যায় ভেসে যায় বিরামবিহীন

উত্তাল ঢেউ দৃশ্যে আমার অন্তরিত সমস্ত বন্দর
ক্রমাগত বিদিশ এই যাত্রা আমার
চোখে পড়ে না বাতিঘর
চোখে পড়ে না গাঙচিল
দিনরাত এই দিনের পর রাত রাতের পর দিন
হাতের মুঠি শিথিল ক'রে ঝ'রে যাচ্ছে
সারা শরীর অবশ আমার শরীর ছেয়ে মৃত্যু
এখন কেমন ক'রে ঐ মোহানায় যাব'
অবসাদে
সময় গোণা সময় গোণা সময় গোণার পালায়
ফেরার মুখে দাঁড় বাইলেও ঐ উজানেই
শরীর আমার যায় ভেসে যায় বিরাম বিহীন

সুশীলকুমার গুপ্ত

আমি চাই

আমি চাই ভালবাস, আরো ভালবাস।
তোমার প্রতিটি ক্ষণ
দখল করুক ব্যগ্র নীরন্ধ্র আমার
স্বপ্নসত্তাস্মৃতি ;
মুক্ত হও আমার গভীরে
নদী পাখি আলোর স্বরূপে,
আন শস্যশিখার উৎসব ;
তুমি আমি হ'য়ে উঠি একবেণী আশ্চর্য কবিতা।

সৈয়দ কওসর জামাল

প্রতিদানে

ভালোবাসা—কতখানি পেলে
হৃদয়ে তরঙ্গ ওঠে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন
স্বপ্নের মধ্যে রাজপথ, ছড়িয়ে যায়
গোলাপী ফুল, অশ্রুসিক্ত চোখে
ঝরে পড়ে সুগোপন ইচ্ছার কয়েক ফোঁটা
ভালোবাসা—কতখানি পেলে তবে
প্রতিদানে ভালোবাসা যায় ?
হয়তো কঠিন হবে শেকল ছেঁড়া
হয়তো ঝলসে যাবে চোখ
অন্ধকারে, অকস্মাৎ আলোর ছটায়
যদিও সহজ ছিল নিঃশব্দে একাকী ভ্রমণ
অথবা একগুচ্ছ ইচ্ছার কুঁড়ি হাতে নিয়ে
কেবলই প্রহর গণনা—এভাবেই সময় গেছে
অথচ সময়ই আবার গর্জে ওঠে তর্জনী তুলে,
শুধু বর্জন নয়—প্রতিদানের দায়িত্বও নিতে হবে।

বিদেশী ভাষা থেকে ঃ

জার্মান

ইনগেওর্গ বাখ্‌মান্‌ (INGEORG BACHMANN)

[অস্ট্রিয়ার ক্লাগেনফুর্ট শহরে ১৯২৬ সালে এই মহিলা কবির জন্ম। রেডিও-নাটক, অপেরা এবং ছোট গল্প রচনায়ও ইনি সমান দক্ষ। এঁর কবিতা অত্যন্ত নম্র নমনীয় এবং হৃদয়ের অনিন্দ্য উচ্চারণে গভীর ও অমোঘ। কিন্তু অনুবাদ করতে গেলে অনেকটা সৌন্দর্যই যেন হারিয়ে যায়।]

প্রত্যহ

যুদ্ধ আর নতুন করে হয় না ঘোষিত,
এ যুদ্ধ চলেছে যেন কবে থেকে। প্রত্যেক প্রত্যহ
পরিচিত অভিজ্ঞতা—কী যে ভয়াবহ।
এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে চিরকাল অন্তর্হিত
বীর যত নায়কেরা। দুর্বলেরা—অগ্নিময় সম্মুখ শিবিরে
সমর্পিত। দিবসের রণবেশ সহিষ্ণুতা ধৈর্যের বিজ্ঞান,
আশার বিপন্ন তারা হৃদয়ের নির্জন তিমিরে
সেই রূপসজ্জা, ফরমান।

এবং তখনই সভা বসে ও মন্ত্রণা
শুরু হয় যখন নতুন কিছু ঘটছে না আর,
সম্মুখ রণাঙ্গনে সমস্ত আগ্নেয় প্রলয় ঝঞ্ঝনা
যখন থামিয়া গেছে, শত্রুরা দৃষ্টির সীমায়
অদৃশ্য হয়ে গেছে, চিরন্তন যুদ্ধ-সজ্জার
অন্ধকার ছায়া নামে সূর্যাস্তের আকাশের গায়।

পতাকাকে ধূলাতলে ফেলে রেখে যেন পালাবার
জন্যই সভা বসে, সলা ও মন্ত্রণা
বন্ধুদের মুখোমুখি সাহসের নবতম জাগরণে, আর
ঘৃণিত গোপন লুব্ধ উদ্‌ঘাটনার
প্রয়াসে এবং উজ্জ্বল সব আদেশের
অবমাননায় এই মূঢ় চারণা।

অনুবাদ—নচিকেতা ভরদ্বাজ

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে ঃ

অসমিয়া

নগেন শইকীয়া

শব্দ হ'তে চাই

আমাকে একটি পাত্র দাও
যার মাঝে উদ্বেলিত
হৈমন্তিক নির্জনতা
টেলিগ্রাফের তারের ওপর বসে থাকা
নিঃসঙ্গ একটি পাখির নীরবতা।

শূন্য কিন্তু পূর্ণ
শব্দহীন তবুও বাঙ্ময় ঃ
যেমন একটি শিশুর
চোখে খেলা করে
প্রথম আত্মার অভিলাষগুলি।

আমাকে একটি পাত্র দাও

বাতাসে ঘোড়া-গাড়ির ঘুঙুরের
সামরিক ছন্দ
ধীরে ধীরে দূর থেকে
আরো দূরে সরে যাওয়ার শব্দ।

সেই ঘুঙুরের ভেতরের যা' নির্জনতা।
তার মাঝে ক্ষরিত হবে
আমার মস্তিষ্কের রক্ত।

তখন উদ্বেলিত হবে
নির্জনতার মধুর কোলাহল।

শুধু শব্দ হ'তে চাই,
শুধু শব্দ
গোপনে নীরবে!

অনুবাদ—সুশ্রী সুজাতা প্রিয়ংবদা

ওড়িয়া

ব্রজনাথ রথ

[ব্রজনাথ রথ ওড়িশার আধুনিক কবিদের মধ্যে একজন অগ্রণী কবি। প্রখ্যাত যুবলেখক সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি এবং 'কাব্য' সাময়িক সংকলনের সম্পাদক]

শিমুল

১

বসন্তের সাম্রাজ্যে এত দুঃখ এলো কোথা হতে ?
যে দুঃখ, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতন
শিমুলের ফুল হয়ে ফোটে ;
যে ফুল রক্তস্রাবী যন্ত্রণার নির্মম দহনে
দগ্ধ হয়ে
আত্মদহনের দুঃখে লোহিত স্বাক্ষর রাখে
আকাশের নীল নীল চারুচিত্র পটে ॥

২

একান্ত আকাশ আর সীমাহীন স্তব্ধ এ প্রান্তর
প্রসারিত যেথা দূর দিগ্‌বলয় সীমা
ফাগুনের ফাগ মেখে নীরবতা সেথা
কথা কয়, শুধু কয় কথা ;
নীরবতা পাখী হয়ে ওড়ে
আর এই পৃথিবীর অগণন মানুষের ভিড়ে
যত দুঃখ যত অশ্রু মর্মান্তিক যত যা বেদনা
ব্যথাদগ্ধ হৃদয়ের ভগ্ন পাত্রে
সঞ্চিত এ জীবনের যত রক্তকণা
শিমুলের ফুল হয়ে কণ্টকিত সহস্র শাখায়
আকাশকে রক্তাপ্লুত করে ;
শূন্যতাকে জানায় প্রার্থনা
এ মাটির স্বপ্নভঙ্গ—তারুণ্যের নিষ্ফল কামনা ॥

৩

বসন্তের সাম্রাজ্যে অগণন দুঃখ যদি
কণ্টকিত শিমুলের ফুল ;
শিমুল ফুলই হোক্ নীলাকাশে উদ্দীপিত
লক্ষ লক্ষ আশার মশাল ॥

অনুবাদ—সুশ্রী সুজাতা প্রিয়ংবদা

পাবলো পুরস্কার পেলেন

অবশেষে কবি পাবলো নেরুদাকে এই বছরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। চিলির এই বিখ্যাত কমিউনিস্ট কবির নাম নোবেল পুরস্কার কমিটির লিস্টে হয়তো অনেক আগেই ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু ওঠেনি তার কারণ বোধহয় তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ। সুইডিশ অ্যাকাডেমি এবার পাবলোর নাম অনুমোদন করবার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, এই নির্বাচন করা হল, "তাঁর এমন কিছু কবিতার জন্যেই যার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাব একটা মহাদেশের ভাগ্য আর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করে।"

পাবলো হলেন চিলির দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক। স্প্যানিশ ভাষী সাহিত্যিক পাবলো নেরুদা একাধারে একজন কবি, উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কমিউনিস্ট এবং উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রনৈতিক কর্মচারী! বর্তমানে তিনি ফরাসী দেশে চিলি সরকারের রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত আছেন। এর আগে ১৯৫০ সালে পাবলো সাহিত্যে সোবিয়েৎ রাশিয়ার স্তালিন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

পাবলোর কবিখ্যাতি প্রথম সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সংগৃহীত ছায়াগুলি' (Crepuscalario) প্রকাশিত হয়। বইখানা তৎকালীন পাঠক সমাজে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। আর তারপর থেকে পাবলো তাঁর নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন কাব্যসাধনায় ক্রমান্বয়ে যশের উচ্চ থেকে উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আজ স্প্যানিশ ভাষায় শ্রেষ্ঠতম গীতি (Lyric) কবি হিসেবে তাঁর আসন সর্বজনস্বীকৃত। খোলাখুলি বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং লাতিন আমেরিকার অনগ্রসর সাধারণ মানুষের দুরবস্থার প্রতিকারে তাঁর শানিত মানবিক চেতনাই পাবলোর কাব্যের প্রধানতম সুর সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর লেখা এমন কিছু অনবদ্য প্রেমের কবিতাও আছে যা স্প্যানিশ ভাষার স্থায়ী সম্পদ বলে গণ্য হবে নিশ্চয়ই।

পাবলোর কর্মজীবনের সুরু একজন সাংবাদিক রূপে। তারপর তিনি সিভিল সার্ভিসে এবং পরে সরকারী পররাষ্ট্র বিভাগের কাজে যোগ দেন। চাকরী জীবনের একটা বিরাট অধ্যায় তাঁর কেটেছে ব্রহ্মদেশ, সিলোন, আর্জেন্টিনা এবং স্পেনে। আর তাই সমকালীন অন্যান্য কবিদের তুলনায় পাবলো সম্ভবতঃ অনেক বেশী আন্তর্জাতিক মনোভাব সম্পন্ন। তাঁর

কাব্যকলায় ফরাসী সুররেয়ালিজম্, এলিয়টী প্রতীকবাদ আর কাফ্‌কার সমগোত্রীয় বাস্তবতার মিলন ঘটেছে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ যে যুগে সুরু হয় তখন পাবলো মাদ্রিদে ছিলেন চিলি সরকারের পররাষ্ট্রবিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে। স্পেনের এই গৃহযুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতাই সম্ভবতঃ তাঁর রোমাণ্টিক ও লিরিক কাব্যচেতনাকে বাস্তব-মুখী করে তুলেছিল। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু তখন থেকেই মোড় ফিরল। সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি পাবলোর কাব্যে প্রধান বক্তব্য হয়ে উঠলো। ঘুণধরা আত্মকেন্দ্রিক ও অবক্ষীয়মান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে চিরন্তন মানবাত্মার বিদ্রোহ ও সংগ্রামের স্বপক্ষে পাবলোর বলিষ্ঠ ও নির্ভীক কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠলো।

যুদ্ধোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের আধুনিকতর ক্রমবিকাশে ফরাসী কাব্যের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। পল ভালেরী, লুই আরাগঁ এবং পল এলুআর বাংলা কাব্যের আধুনিক ক্রমবিকাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপর চতুর্থ কারো নাম যদি উচ্চারণ করতে হয় তবে তিনি নিঃসন্দেহে পাবলো নেরুদা। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এমন লেখক কিংবা পাঠক খুব কমই আছেন যিনি আজও পাবলো পড়েননি। তাঁর কাব্য চেতনার বলিষ্ঠতা, বাস্তবানুগ সাবলীল ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং দরদী মন বাঙালী কাব্যানুরাগীদের অতি সহজেই কাছে টেনে নিয়েছে। নেরুদার Ode to Stalingrad (স্তালিনগ্রাদের প্রতি কাব্যগাথা) এই কিছু দিন আগেও অপূর্ব উদ্দীপনায় বাঙালী ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরেছে। নেরুদার কাব্যের কিছু কিছু এর মধ্যেই বাংলায় অনুদিত হয়েছে। এবং অনুবাদ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দের মতন ব্যক্তিত্ব ও আছেন।

ব্রহ্মদেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে পাবলো নেরুদার মধ্যবয়সে লেখা তিন খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ 'পৃথিবীর বাসস্থান' ('Residence on Earth') এক সময়ে বাঙালী পাঠকদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্রী হয়েছিল। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হচ্ছে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত'। এই কাব্যগ্রন্থটিকে অনেকে লাতিন আমেরিকার মহাকাব্য আখ্যা দিয়েছেন। জন মানসের আশা-আকাংখার দ্যোতকরূপে পাবলো নেরুদার কবিকৃতি সম্পর্কে এই আখ্যা একটুও অতিরঞ্জন নয়।

—শিশির ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

১

বাংলা কবিতার পালাবদল চলেছে দশকে দশকে। বাংলা কাব্যের ধারাস্রোত যে কোন সময়েই শীর্ণ হয়ে পড়েনি বরং প্রাণশক্তির প্রাবল্যে সে স্রোত উচ্ছ্বসিত এবং বেনোজলের মত বেগবতী, তার পরিচয়ও প্রত্যক্ষ। এই অতিরিক্ত জলোচ্ছ্বাস হয়ত সুফসলের উপযোগী সবক্ষেত্রে না হতেও পারে; কিন্তু কাব্যবেদনায় সাম্প্রতিক যুগের বাঙালী মানস যে পরিপূর্ণ এইটুকু জেনেই সাহিত্যরসিকেরা তৃপ্ত হতে পারেন।

সাম্প্রতিক কবিতা নিয়ে কিছু বলবার আগে আমার কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার এই নামকরণের। সাম্প্রতিক বলতে আমি 'আধুনিক' অর্থের গণ্ডি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি। 'আধুনিকতা' অনেক ব্যাপক ও গভীর একটি ধর্ম, যার প্রকাশ দশকে দশকে ঘটেনা। প্রতি বছরেই মানুষ নতুন কিছু ভাববার চেষ্টা করতে পারে, এমনকি তার ভাবনাকে নতুন রঙের আলোকে তুলে ধরতেও পারে কিন্তু তাতে সে আধুনিক হয় না। আধুনিক সেই, যে প্রচলিত এবং প্রাচীন রীতিনীতিকে অস্বীকার করে নতুন কৌশল ও রীতির প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অর্থাৎ যে আগামী কালকে আপন নৈপুণ্যে নতুন করে গড়বার শক্তি রাখে।

বাংলাকাব্যে আধুনিকতার সৃষ্টি যাঁরা সম্ভব করেছিলেন তাঁদের ধারাই এখনও চলছে। কিন্তু দশকে দশকে যাঁরা অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগে এবং চিন্তার রূপকে অস্পষ্ট করে নতুনতের সৃষ্টি করতে চান তাঁদেরকে সাম্প্রতিক বলা যেতে পারে আধুনিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে আধুনিক ছিলেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই তার থেকে সরে এসেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা চিন্তাবিপ্লব দেখেছিলাম, যে বিপ্লবের সুরকে বহন করে নিয়ে এলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আরও অনেকে। যতীন্দ্রনাথ বা মোহিতলাল থেকেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যিনি—সেই জীবনানন্দ কাব্যধারায় বাঙালী চেতনার প্রবাহে ইউরোপীয় সুররিয়ালিজমের

নির্ঝর ধারার যোগসাধন করেছিলেন। একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে. আধুনিকতার যে বিপ্লব তা' স্বয়ম্ভু নয় ; জাতীয় চেতনার ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েই তার আত্মপ্রকাশ। তাই সমকালীন যুগ পর্যন্ত আমরা বাংলাকাব্যের ধারায় মোটামুটি সেই আত্মচেতনার প্রবাহকে স্বতন্ত্র করে' লক্ষ্য করতে পেরেছি—এতে আমরা খুশী। কিন্তু তারপরেও ভাবতে হয়—যখন মনে হয় কাব্য নদীর প্রবাহে আবার রূপবদলের নতুন ঢেউ।

সাম্প্রতিক কাব্যধারায় যে কয়েকটি রূপ মোটামুটি চোখে পড়ে তার মধ্যে পড়ে—প্রথমতঃ ছন্দহীন ভাষায় কবিতারচনার প্রয়াস। ছন্দহীন কথাটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম। কারণ গদ্যকবিতার ভাষায় যে রূপময়তা ও ধ্বনি-ব্যঞ্জনার গাঢ়তা থাকা প্রয়োজন, তা হঠাৎ উঠতি তরুণ কবিদের হাতে সম্ভব কিনা ভাবার প্রয়োজন আছে। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। যে শিল্পী রাগরাগিণীতে পূর্ণদক্ষতা অর্জন করেছে, শুধু সেই পারে রাগরাগিণীর বন্ধনমুক্ত হয়ে নতুন পথের সন্ধান করতে। ভাষাজ্ঞান যার পুরোপুরি আছে, সেই পারে ভাষাকে মোচড় দিয়ে নতুন পথে প্রবাহিত করতে। কিন্তু শিল্পের ব্যাকরণ যার অজানা, সে কেমন করে আনাড়িহাতে নতুন শিল্প প্রকরণের সৃষ্টি সম্ভব করবে! কবিতার ছন্দ যে শেখেনি, যার কাণ ছন্দে অভ্যস্ত নয় সে কেমন করে গদ্যকবিতা লেখার স্পর্ধা রাখে ?

অর্থাৎ শব্দ সাজিয়ে পংক্তি সাজিয়ে বসালেই তা কবিতা হয় না। কবির সবচেয়ে বড় গুণ—তার কাণ। যার কাণ তৈরী নেই, তার উচিত সবার আগে ছন্দের কাণ তৈরী করা।

দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রতিক কাব্যের চরিত্রে শরীরজ প্রেমের প্রকাশ শুধু স্পষ্ট নয়, অত্যন্ত নগ্নচেহারায় প্রত্যক্ষ। প্রেম কাব্যের চিরকালের বিষয়বস্তু। শরীরকে প্রেম থেকে বাদ দেওয়া বাস্তব ধর্মিতার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব-ধর্মিতার সীমা যেখানে কাব্যের গুণ্ঠনকে উন্মোচিত করে' তাকে অসুখকর নগ্নতায় প্রকাশিত করে, সেখানে সে রচনা আর যাই হোক সুকাব্য নয় অর্থাৎ কাব্যের সেখানে রসাভাব ঘটেছে।

তৃতীয়তঃ বিক্ষিপ্তচিন্তার মধ্যেও একটা সুর থাকতে পারে। কবির চিন্তা আর আলুবেচা দোকানীর চিন্তার ধারায় মৌলিক পার্থক্য থাকতে বাধ্য। সে পার্থক্য শুধু ভাষার পার্থক্য নয়, চিন্তার গতির এবং গ্রন্থনার পার্থক্য।

সবশেষে আমার বক্তব্য কোন শিল্পই হঠাৎ অনায়াসে সৃষ্টি করা যায় না। প্রবল সাধনা না থাকলেও কালজয়ী কিছু তৈরী করা যাবে, এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা বারোবছর সাধনা করে মোটামুটি চলন সই গোছের লেখাপড়া শিখি। আর হঠাৎ স্বয়ম্ভু হয়ে কবি হয়ে যাবো—এমন প্রত্যাশা শুধু অসঙ্গত নয়, অন্যায়। কবিপ্রতিভা যাঁর আছে তাঁকে পরিশ্রমে সেই প্রতিভাকে সৃষ্টিময় করে তুলতে হবে। তাই শিল্প সৃষ্টির ভূমিকা যে শিল্পীর দীর্ঘ সাধনায় গড়ে ওঠে, এ'কথা যেন না ভুলি।

* * * *

সম্প্রতি কয়েকটি কাব্যসংকলন হাতে এসেছে। সত্তরের দশকের কবি নগেন্দ্র দাশ তরুণতমদের মধ্যে একজন। তাঁর 'যাদুঘরে একা' সাম্প্রতিক প্রকাশিত কবিতার সমষ্টি হলেও কবিতাগুলির মধ্যে কবির হৃদয়কে ছোঁওয়া যায়। মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি, মাঝে মাঝে আবেগে প্রবল। ভাষার মধ্যে কোথাও কোথাও হয়তো আড়ষ্টতা ; তবু অন্তরঙ্গতায় ভাববহ। অতি আধুনিক কবিতার উল্লেখযোগ্য দুর্বোধ্যতা প্রায় কোথাও নেই।

যেমন—

"...আমার অতীত নদী এই আমি রুপালি প্রবীণ/সর্বাঙ্গে নিয়ে নিকটের আকাশ আসে সদর্প' শোণিতে/যখন সর্বকাল জনপথে অন্তর্লীন/যাদুঘরে একা আমি/চির জাগরূক" (যাদুঘরে একা)।

অথবা—

"...সবৎসা গাভির আদর জিভে নিয়ে/কী রকম মুছে নেয় রোম উফল দুধের ঘ্রাণ ঘাসে লেগে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে/অন্যতর কথা আসে..." ইত্যাদি।

সুন্দর ছবি। পড়তে ভালো লাগে। কিন্তু তবুও নগেন্দ্র দাশ আর একটু স্পষ্ট হবার চেষ্টা করলে তাঁর কবিমনের প্রকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

যে রকম হয়েছে 'মেঘ ময়ূর এবং অন্যান্য'র কবি কমল সাহার কাব্যভাষায়। বেশ টলটলে স্রোতের মত একটু জলের ধারা খোয়াই এর প্রান্ত ঘেঁষে যেন বয়ে যাচ্ছে—

একলা দাঁড়াই সোনাঝুরি বনে/হলুদ বালক উদাসী জামায় পালি আর কাদা ঢিল ছুঁড়ে মারি মধ্যপুকুরে হঠাৎ যখন/বুকের গভীর ব্যথিত বাগান ভেঙে

খান খান্/পড়ে থাকে শুধু নির্জন ঘটে রাত্রির মত তরঙ্গ হীন/পুরাতনী মাঠ ধু ধু মেঠোস্বর···

কিংবা—

"অরণ্য প্রাচীর থেকে আরো দূর/বহুদূর সোনালী মাঠের শেষে/যতদূর চোখের সীমানা/ততদূরে···"

অথবা—

"পৃথিবীর সব আলো নিভে এলে/অন্ধকারে বাকি থাকে জোনাকির রঙ/"

অথবা—

"বৃষ্টিরা শেফালি হয়ে ঝরে পড়ে/নাগরিক ভীরু দোতলার ছাদে/মেঘ যেন ঢেকে দেয়/ভিক্টোরিয়া পরীটির পাখা।/" ইত্যাদি। স্বচ্ছ কবিমনের সহজ সুন্দর প্রকাশ !

কিন্তু হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে, নদীতে চলতে গিয়ে ডুবো পাথরে আটকে যাওয়ার মত। মনে পড়ে গেল কমল চক্রবর্তী ফার্ণেস আর বয়লার এর কবি। তাঁর কাব্যে 'দগ্‌দগে পচা ঘা' "পোকা কাদা নোংরার···"সাথে মিশে গিয়েছে। "চার নম্বর ফার্নেস চার্জড্" নিয়ে যিনি কাব্যের বিষয়বস্তু গড়ে তুলতে প্রয়াস পাচ্ছেন, তাঁর কবিতা সম্পর্কে এখনও কিছু বলবার সময় আসেনি।

সুকোমল রায় চৌধুরীও সত্তরের দশকের কবি। তাঁর মন সত্যিই সুকোমল। কবিতায় উচ্ছ্বাস এখনও সোচ্চার—"সমুদ্র দেখার আগে নীল চোখে দেখে নাও/হৃদয় ভেজাতে প্রয়োজন কতটা সময়।"

অথবা—

'তমিস্রায় ডুব দিলে/মাটির উষ্ণতা নিয়ে সমস্ত শরীর/সরল আত্মায় মিশে হিরণ্ময় হয়।'

কিম্বা—

'ঘাসের পাতার চোখে শিশিরের জল'—ইত্যাদি কবি মনের সুন্দর অভিব্যক্তি। কিন্তু তবুও বলা যায়, কবিতার ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ব করতে আরও কিছুটা সময় নিতে হবে তাঁর।

ঠিক অনুরূপ কথাই বলা চলে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে। তাঁর "ভাবনায় সাম্প্রতিক শব্দগুলি" মনের মধ্যে একটা রহস্যের আভাস দিলেও

ঠিক আশান্বিত হয়ে উঠবার মত এখনও কিছু চোখে পড়ছে না। তাঁর উচ্চারণে অস্পষ্টতা আছে। যদিও কবিমনটিকে ভাল লাগে।

তবু মোটামুটি ভালো লাগলো। কারণ ইচ্ছাকৃত জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস উপরিউক্ত কবিতা সংকলনগুলির কোনটিতেই নেই। সাম্প্রতিক কবিতার ধারায় আবার রূপবদলের সুর। আশা করা যায় সত্তরের দশকে যাঁরা কবিতা সৃষ্টির ভার নিয়েছেন ; পরের দশকে তাঁরা আরও একটু আত্মস্থ হবেন। তাঁদের কাব্যে রূপকল্পের সেই জগৎ দেখা যাবে যা' একান্তভাবে কবিরই জগৎ।

—সন্তোষকুমার অধিকারী

১। যাদুঘরে একা। নগেন্দ্র দাশ। সত্তরের কবিতা প্রকাশনী। দাম ৩ টাকা

॥ মেঘ ময়ূর এবং অন্যান্য। কমল সাহা। ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা প্রকাশিত। দাম ৩ টাকা

৩। চার নম্বর ফার্নেস চার্জড্। কমল চক্রবর্তী। কৌরব প্রকাশনী। দাম ২ টাকা

৪। ভুল সুকোমল। সুকোমল রায়চৌধুরী। সত্তরের কবিতা প্রকাশনী দাম ২ টাকা

৫। ভাবনায় সাম্প্রতিক শব্দগুলি। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্ণব প্রকাশনী। ২·৫০ টাকা

২

বেশ কিছুদিন আগে কোন এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম তিনি বাড়ী নেই ; তবে আধঘন্টার ভেতরই ফিরবেন। প্রয়োজনটা জরুরী ছিল তাই অপেক্ষা করাই সঙ্গত মনে হল। বন্ধুবরের ঘরে একা বসেও সময় কাটানো খুব একটা মুস্কিল ছিল না। কারণ সামনেই র‍্যাক ভর্তি আধুনিক গল্প ও কবিতার অজস্র বই ও পত্র পত্রিকা! যদিও বন্ধুটির একটি মজার অভ্যাস হল বইগুলোর পেট ভেতর দিকে রেখে উল্টো মুখ করে শেলফে সাজানো। সম্ভবতঃ অবাঞ্ছিত পাঠককে (যিনি বই পড়তে নিয়ে গিয়ে ফেরত দেবার নাম করেন না) ঠেকানোই তাঁর উদ্দেশ্য। কারণ কোন বইয়েরই নাম জানবার উপায় নেই টেনে বার না করলে। ব্যাপারটা জানতাম আমি। তাই যে কোন একটা বই নেবার জন্যে হাত বাড়ালাম। লাল একটা মলাটের ঈষৎ উঁকিঝুঁকি আমাকে আকৃষ্ট করায় সেটাই টেনে বার করলাম। বইখানা একটা কবিতা সংকলন। লেখকের নাম আমার স্বল্প পরিচিত। বইয়ের কভারটি বেশী আধুনিক হতে গিয়ে আকর্ষণীয় হয় নি। একমাত্র লাল রংয়ের উজ্জ্বলতা ছাড়া। বইয়ের নামকরণ যতটা তাত্ত্বিক ততটা কাব্যিক নয়। ছাপা মফস্বলে হলেও মোটামুটি মন্দ নয়।

বইখানা মাঝামাঝি ওল্টাতেই প্রথমে যে ছোট্ট কবিতাটা চোখে পড়ল, বেশ বিস্মিত হলাম পড়ে। নাম "মৃত্যু"।—

"সব কিছু যথারীতি। বিস্ময়ের কিছুই ঘটে না।/কেবল কয়েকদিন কেউ তার চেয়ারে বসে না/জামা ঝুলে থাকে দেয়ালের হুকেঃ ঠিকানায় চিঠিগুলি কিছুদিন ঘুরে ফিরে আর/কোনোদিন ভুলেও আসে না/এবং অজ্ঞাতসারে কেউ দরোজার নেমপ্লেট খুলে নিয়ে যায়।"

আমার বন্ধুটি আধঘন্টা নয় প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে ফিরলেন। এবং ততক্ষণে আমি বইটার অনেক অংশই মোটামুটি পড়ে ফেলেছি। অনেক জায়গায় ভাল লেগেছে। কোথাও বা লাগেনি। কিন্তু একটা কথা বেশ পরিস্কার ভাবে সেদিন আমার মনে হয়েছে যে আজকালকার এই তথাকথিত আধুনিক বাংলা কবিতার শব্দ-সর্বস্বতার যুগে ; যে যুগে অধিকাংশ কবিই নিজে কিছুই না পড়ে কেবল কতকগুলো বক্তব্যবিহীন দুর্বোধ্য শব্দ পাশাপাশি

সাজিয়ে 'কবিতা লেখা-কবিতা লেখা একা দোক্কা খেলা' চালান, সে যুগে তরুণ কবি রবীন সুর তাঁর (সম্ভবতঃ প্রথম) কাব্যগ্রন্থ "অন্তর্গত নদী"তে একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

এই ঘটনার অনেক পরে রবীনের এই গ্রন্থটি সমালোচনার জন্যে আমার হাতে আসে। এবং আমি বইটি আবার আদ্যোপান্ত পড়ি। আজও মনে হচ্ছে কবি রবীন সুরে সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টাবার কোন কারণ ঘটেনি।

সংকলনের সমস্ত কবিতাগুলো পড়ে দেখবার পর আমার মনে হয়েছে দীর্ঘতর কবিতাগুলোর তুলনায় রবীন ছোটছোট কবিতাগুলিতেই অনেক বেশী সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।—"দেবদারু বৃক্ষের ঋজুতা/আকাশ পেরিয়ে যায় অন্যএক আকাশের নীল অভিপ্রায়ে/যেখানে···রাত্রি তার রহস্য কাহিনী/নক্ষত্রের আখ্যায়িকা উদ্বেলিত মৌন উপন্যাসে/রেখেছে তৃপ্তির পাঠ, অন্ধকার নিঃসঙ্গ হৃদয়।" (দেবদারু)। কিংবা—"তোমার যা খুশী তাই ডিক্টেশন দিয়ে যেতে পারো/আমি নির্বিকার জেনো খোলাখাতা কুমারী স্বভাবে/তার শুভ্র বাসনার পেন্সিলের অহঙ্কারে উৎকীর্ণ অক্ষর···(স্টেনোগ্রাফার)। অথবা—"পুনর্বার আমন্ত্রণে/আমি কি ফিরে যাবো?/···একদা তার সমর্পিত দেহ/দেহলতার গন্ধটুকু/স্মৃতির কিংখাবে/যত্নে রেখে ভালোবাসার/ঘোচাবো সন্দেহ!···(ভালোবাসা) ইত্যাদি। বড় কবিতার মধ্যেও কতকগুলো যেমন অন্তর্গত নদী, যারা রক্ত খায়, লোকোশেড পড়তে ভালোলাগে। কিন্তু অনেকগুলো বড় কবিতায় কবি অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করতে গিয়ে চিন্তার পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেন নি। যদিও তাঁর অনেক বর্ণনার বিন্যাসে সূক্ষ্ম দৃষ্টি শক্তির প্রশংসা করা উচিত। গদ্য কবিতার (অমল চন্দকে অর্পিত···) রচনা শৈলীতে কোন নতুনতর পাওয়া গেল না। এই সংকলনের অনেক কবিতাতেই রবীন বলতে চেয়েছেন যে এই নিরাসক্ত উদাসীন নগর-জীবনে—"প্রত্যহের উৎকট সম্ভবগুলি/সব কিছু প্রতিরোধ বিধ্বংসী আচারে/ক্রমাগত ভেঙে যায় অনুভব···স্বেচ্ছাচারী আলোড়নে/সব কিছু ওলোট পালটে/হৃৎপিণ্ড অবধি···দুরপনেয় আমাদের সাম্প্রতিক জ্বালা/সম্ভাবিত ভবিষ্যের কোনরূপ উদ্ধার দেখি না।"—আধুনিক সমাজের হতাশাময় পরিবেশে রবীনের মত একজন অনুভূতি প্রবণ সংবেদনশীল কবি মানুষের পক্ষে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। এবং আধুনিক যুগের মানুষ হিসেবে একজন কবির কবিতায় যুগযন্ত্রণার ছাপ পড়বে, এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু কবি আশাবাদী হবেন

কি নৈরাশ্যবাদী হবেন তা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিগত মানসিক গঠনের ওপর। রবীনের বইয়ের সব কবিতা পড়ে আমার মনে হয় যে আসলে তিনি সত্যিই নিরাশাবাদী মানুষ নন। নিরাশাবাদ তাঁর "আরোপিত অনুভূতি বা super-imposed thought" মাত্র। ফলে তাঁর অনেক কবিতার পেছনেই আর একজন অতিপরিচিত নামী কবির ছায়া দেখা যায়। রবীনের স্বাভাবিক কবিসত্তা যন্ত্রণার ছদ্মবেশ থেকে মুক্তি চায়—"যন্ত্রণার ছদ্মবেশ হতে তুমি কবিতা আমার/মুক্তি দাও।"…"কবিতা আমায় তুমি স্থিরতর আলোর বন্দরে/ কবে নিয়ে যাবে,"…"আলোর পিপাসা আমি বনস্পতি অপেক্ষায়…/ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখি অগোচরে বুকের গহনে।"…"উঠোনের পানপাত্রে হলুদ রোদের মদ। ঢেলে দেয় স্বচ্ছতার সতেজ সকাল।"—এবং এই রকম আরো অনেক।

মোটামুটি ভাবে একথা বলা যায় রবীন একজন স্বভাব কবি। অর্থাৎ যে সব কবি সখের খাতিরে কবিতা লেখেন আর সখমিটে গেলেই দুদিন বাদে লেখা ছেড়ে দেন, রবীন তাঁদের দলে নন। তাঁর ভাষাজ্ঞান ভালো। শব্দ নির্বাচন ও ব্যবহার সুন্দর যদিও কয়েক জায়গায় অনাবশ্যক জটিল, কোথাও কোথাও অবৈজ্ঞানিক। যেমন—"বিস্ফারিত শব্দরাশি…/পুনর্বার কেন্দ্রাতিগ অভিকর্ষ ত্যাগ করে…" ইত্যাদি (যখন নৈঃশব্দ) অভিকর্ষ বা gravitional force of attraction কখনো কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্র বহির্মুখী হতে পারে না তা সর্বদাই কেন্দ্রাভিগ বা কেন্দ্রমুখী। রবীনের বিদেশী শব্দের ব্যবহার বেশ সুষম এবং উচ্চারণ উৎকৃষ্টরকম শুদ্ধ। ছন্দের দিক থেকে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা নেই বল্লেই হয়। ফলে কবিতাগুলোর উচ্চারণে একটু একঘেয়েমি এসে গেছে। যাই হোক প্রথম সংকলনের দুর্বলতাটুকু উপেক্ষা করে একথা অনায়াসেই বলা যায় যে রবীন সুর তাঁর নিজস্ব এবং স্বাভাবিক কবি সত্তায় আত্মপ্রকাশের পথ অচিরেই খুঁজে পাবেন।

—শিশির ভট্টাচার্য

অন্তর্গত নদী। রবীন সুর। স্বপক্ষ প্রকাশন, নৈহাটি। দাম ৩·৫০

একটি খোলা চিঠি ঃ

'স্বনির্বাচিত' প্রসঙ্গে সাহিত্যের এক অবতার এবং এক কর্মচারী সমীপেষু,

.....

মহাভারতে আছে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে গাণ্ডীব খুলে রাখতে বলেছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের পণ ছিলো, গাণ্ডীব খুলে রাখার অপমান যদি তাঁকে কেউ করে তবে তাঁকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা ছাড়া অন্য কোনো পথ আর খোলা থাকে না। শেষ পর্যন্ত অর্জুন তো চললেন অগ্রজের শিরচ্ছেদ করতে। পথ আটকালেন পাণ্ডব সখা শ্রীকৃষ্ণ। বললেন—হে সখা—এ তোমার বৃথা আস্ফালন। এ কথা নিশ্চিত জানি, তোমার তূণ কখনো ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত হতে পারে না। তা এক কাজ কর—তুমি তোমার অগ্রজের কর্ণকুহরে অবিশ্রান্ত ধারায় প্রশস্তি বর্ষণ কর। মহান সৎ প্রকৃত গুণীর কাছে আত্মস্তুতি শোনা বিষতুল্য, মরণ-সম। সখা ঢেলে দাও কানে…

[প্রেস, উপরের লেখাটা বাদ দিয়ে কম্পোজ করবেন]

ক'লকাতায় মহাপুরুষের বাণী

ঃ অন্য একটা লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে হাতের কাছে কি একটা পত্রিকায় দেখলাম 'স্বনির্বাচিত' সম্পর্কে আপনার অমেয় বাণী। অগ্রজ-প্রতিমেষু, অধমের প্রতি আপনার হঠাৎ এই করুণা কেন? ভগবানের হাতে খুন হয়ে নীচ দস্যুর স্বর্গলাভের ব্যবস্থা করার জন্যেই কি এই ক্লেশ?

ঃ হে রাজন, আপনি বাংলা সাহিত্যের মহান আশ্চর্য প্রতিভাশালী এক একক প্রদর্শনী! সমবেত প্রতিস্পর্দ্ধীর মধ্যে কেন এই অর্বাচীনদের খামোকা টানলেন? আপনিতো বাংলা সাহিত্যের ক্ষণজন্মা সম্পদ। আপনার ক্ষেত্রতো বিশ্বব্যাপী। ত্রিভুবন ছোটো গল্পের আসরে আপনার স্থানতো প্রথম সারির প্রথম দিকে। আপনিতো নিশ্চিত জেনেই গেছেন—সাহিত্য যদি সত্যভাষী হয় তাহলে একশো কিংবা হাজার বছর বাদেও আপনার বইয়ের খোঁজ পড়বে। আপনি তো ত্রিকালজ্ঞ, স্বয়ংভূ। আপনিই বাংলাদেশের লিটিল ম্যাগাজীনের একমাত্র মদন। আপনার কথাইতো শেষ কথা। আপনার বিচারইতো

সাহিত্যের মানদণ্ড। আপনার বাঁশের জন্যেইতো 'স্বনির্বাচিতে'র বাঁশি, বিক্রিবাট্টা এ্যাদ্দিন বন্ধ ছিলো। তা যখন করুণাই করলেন তখন এত লেট কেন? এই রকেটের যুগে এ্যাদ্দিনে তো চাঁদ থেকে ছবি তুলে এনে সিনেমায় দেখানো হয়ে যায়। দেখুন তো, এর মধ্যে দু'আড়াই হাজার কপি গলে গেল, এ্যাণ্ড উইদাউট কোয়েশ্চনিং হোয়াই! আর পাঠকরাও কম অসভ্য নয়, পড়বি তো পড়, অভিনন্দন জানানোর কি দরকার? চিঠিপত্র দেশ ও বিদেশের থেকে যা এসেছে তাতে আপনাকে আমাকে ঢেকে দেওয়া যায়। একটাকা দুটাকা নয়, কড়কড়ে বারোটা টাকা খরচা করে এই অপকম্মো কেউ করে? কি ঔদ্ধত্য! হে করুণানিধি ঈশ্বর, এদের মার্জনা করুন।

ঃ হে সাহিত্যের গোলাপ, আপনার জায়গাতো আলাদা করে চষা মাটিতে। আপনি এই অবহেলিত ঘেঁটুর বিরুদ্ধে কেন শিঙা ফুঁকলেন? আমি তো অতি দীন, নরাধম নগণ্য, না-গণ্য আপনার বি-সম লজ্জা।

ঃ তা মহান অগ্রজ, দীনের নিবেদন—আসল ব্যাপারটা কি? কি আপনার ক্রোধের হেতু? আপনার অমৃতবাণী তো কিছুই অনুধাবন করা গেল না। বিশেষজ্ঞ কমিটি বসিয়েও না। সবই যেন ভাসা ভাসা, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। জানি—যুগে যুগে অবতারেরা এম্নিভাবেই বুঝি ভক্তদের ধন্য করেন। তা আবার এরমধ্যে কেন সাহেবসুবোদের টানতে গেলেন? আপনি অবাক হয়েছেন 'এলিয়াট?' বানান দেখে। কেন, হয় না? যাঃ, এটা আপনার অনধিকার চর্চা। এসব ব্যাপারে প্রেমেন দা, বিষ্ণু বাবু কিছু বললে-টললেও ভাবা যেতো। তাই ভক্তকে আপনি দারুণ হাসিয়েছেন যাহোক। কখনো কখনো মহামানবেরা নর-মন পরীক্ষার জন্যে তাঁর বাউণ্ডারী পার হয়ে যান, এটাকি আপনার সেই ছদ্মবেশ? আর কোটেশনের ব্যাপারে যা বলেছেন সে ব্যাপারে অধীনের কিছুই করার ছিলো না, কারণ সংকলনভুক্ত কবিদের পরিচয় করিয়ে দেবার পর সম্পাদক কি নিজেদের কথা নিজেরাই জাহির করবেন? যা আপনি করলে মানায়, তাকি আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্রের সাজে? আপনি 'সর্ব হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম [মাণ্ডুক্যোপনিষদ] সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডতেই তো আপনি একক। আপনার যা মানায় তব অনুগামী দাসের পক্ষে তা কি সম্ভব? তাই 'দেশ' 'অমৃত' নামক দুটি ক্ষুদ্র পত্রিকার কথা তুলে দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, তার আগে আপনাকে দারুণ খোঁজ করেছিলাম কিন্তু তখন আপনি অদৃশ্য। পরে শুনলাম—আপনি মানুচকে দর্শন দিয়েছিলেন। আপনার লীলে বোঝা ভার।

হে মদন মোহন, আপনি মন্মথে মনকে মথিত করেন। কার সঙ্গে কার কথা। আমাদের লেখা কি একটা লেখা? ছাপুক না দশটা নামজাদা কাগজ, রাখুক সমস্ত সংকলন-সম্পাদকেরা, আপনি তো জানেন আসলে কি মাল, নীরেট, ঘৃণ্য পৃথিবীর [বিশেষ করে বাংলাদেশের] মানুষ। আপনিতো বায়বীয়, ঘোষণায় বোঝা যায় আপনার অস্তিত্ব। আপনাকে কাছে টানে কার বাপের সাধ্যি। আপনি অনুগ্রহ করে বলেছেন—আমার লেখা নাকি বাংলাভাষার মতো মনে হয়েছে। হে সর্বজ্ঞ, স্বাস্ত্রজ্ঞ, তাতো লাগবেই। সংস্কৃত উর্দু পালি হিব্রু যে কোনো ভাষাতেই আপনার অবাধ গতি। আমার গুরুর ঐ বাংলা ভাষাটাই আসে। হতে পারে এটা আমার অপরাধ। নিঃসন্দেহে, আপনি যখন বলেছেন তখন অপরাধই। অস্বীকার করবো এমন ঘাড়ে মাথা নেই। এর মধ্যে আবার কবি উৎপল বোস, সিদ্ধেশ্বর সেনের মতো নির্বিরোধ ভালোমানুষকে টানলেন কেন? সিদ্ধেশ্বর দা পরবর্তী সংকলন 'বাংলার মুখে' সহযোগিতা করেছেন, আর উৎপল বসুর বিদেশের ঠিকানা অনেক খোঁজ করেও শেষ পর্যন্ত পাইনি।

'আর সিকি কোটি টাকা ব্যয়ে হিন্দি ছবির মতো' বাংলা কবিতার জন্যে না হয় খরচই করা হল। এতে যদি বিদেশের মান অনুযায়ী প্রোডাক্সেন হয় তাহলেও আপনার আপত্তি? তা আগে বলেননি কেন রাজা, এখন অবোধ বালকদের পালক হিসেবে মার্জনা করুন। আপনার যা বিশ্বরূপ দর্শন দেখেছি, তাতে আপনার কাছে ভক্তের নতজানু হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

দৈনিক কবিতায়

'নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজীকরে
তেমনি নাচাও তুমি অর্বাচীন নরে'

হায় জীবনানন্দ প্রসঙ্গে

একদিন ক্ল্যারিওনে গিয়ে একটি কবিতার কাগজের তল্পিবাহককে বিল ভাউচার, ব্লক পত্রিকা জমা দিতে দেখেছিলাম। উপরওয়ালার যাবতীয় কাজকর্মের জন্যে সর্বক্ষণের একজন তত্ত্বাবধায়ক পরবর্তী কিছু সময়ে কবিতা মক্সো করেন এবং তারপরেই দারুণ সমালোচক হয়ে যান। হাতে কলম ধরিয়ে কিলিয়ে পাকানো এই ডেঁপো ছোঁড়াটির লেখা শুরু করার ভাষা দেখুন—

'ইদানিং কালের সংকলন নামক এক প্রকার পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে **আমি কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করছি না।' ইত্যাদি ইত্যাদি।**

আসলে কবি জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা যা তথ্য দিয়েছি তা বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। বর্ণপরিচয়ের গোপাল বড় সুবোধ বালকের মতো বনলতা সেনও আমাদের কণ্ঠস্থ। বেশ কয়েকজন লোক লাইনোর পাণ্ডুলিপি কপি করায় প্রেসে কয়েকটি ভুল থেকে গেছে। জীবনানন্দের 'দুটি'ও ঠিক সেইরকম একটি মারাত্মক ভুল। ভুল ভুলই। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় নতুন শব্দ যোগ করা সম্ভব? বৎস, আপনি তো সাহিত্যের লোক নন, একজন সাধারণ কর্মচারী। আপনার পক্ষে এ ভাবা অস্বাভাবিক নয়। এ ব্যাপারে আপনার উপরওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন, এ সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে আমার অনেক আগেই কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিলো। তাঁরা বড় ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কখনোই আলোচনা করবেন না। সেই তাঁদের বিনা অনুমতিতে যখন একটা লেখা ছাপা হয়ে গেল তখন লজ্জাটা তাঁদের, আপনার নয়। এ অভিজ্ঞতা কি আপনার নেই যে—ঐ পত্রিকায় কবির নাম ছাড়াই কবিতা ছাপা হয়ে যায়? এরকম অসংখ্য উদাহরণ আমার হাতে আছে। আর ওই পত্রিকার কবি সমীক্ষার কেচ্ছাতো ইতিমধ্যেই বাজারে চাউর হয়েছে। তাই না?
আর 'তদবির তদারকী'?

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে তাহলে সাপ বেরিয়ে পড়বে। আপনার লেখাটা প্রেসে দেবার আগে কেন একবার আপনার উপরওয়ালাদের দেখালেন না ভাই। কপি হাতে ধরে সবচেয়ে আগে এই কথাটা লাল কালিতে তাঁরা কেটে দিতেন। কি মারাত্মক লোক মশাই আপনি! যে ডালে বসে আছেন তার উপরেই কোপ! বলিহারী বুদ্ধি!

—শান্তনু দাস

With best compliments from :—

BHOLARAM AGARWAL
IRON AND STEEL MERCHANT

9, RAWDON STREET,
CALCUTTA-17